حقائق الإسلام

بِاللُّغَةِ الْبَنْغَالِيَّةِ

ইসলামের বাস্তবতা

تأليف : عبد الحميد بن صديق حسين

(الداعية بالمكتب)

সংকলনেঃ

আব্দুল হামীদ বিন সিদ্দীক হুসাইন

مراجعة: عبد النور بن عبد الجبار

সম্পাদনায়ঃ

শাইখঃ আব্দুন্ নূর বিন আব্দুল জব্বার

প্রচারেঃ

ইসলামিক দা'ওয়াহ সেন্টার

খামিস মোশাইত, সউদী আরব।

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط

تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

www.islamdeen.com

ح

عبد الحميد بن صديق حسين ، ١٤٣٣ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

حسين ، عبد الحميد صديق
حقائق الاسلام . / عبد الحميد صديق حسين . – خميس مشيط ،
١٤٣٣ هـ
.. ص ، .. سم
ردمك : ٦-١٠٥٠-٠١-٦٠٣-٩٧٨
(الكتاب باللغة البنغالية)

١- الاسلام – مبادي عامة ٢- الايمان (الاسلام) أ.العنوان
ديوي ٢١٠ ١٤٣٣/٨٩٦٦هـ

رقم الإيداع : ١٤٣٣/٨٩٦٦هـ
ردمك : ٦-١٠٥٠-٠١-٦٠٣-٩٧٨

গ্রন্থের নামঃ ইসলামের বাস্তবতা

সংকলকঃ আব্দুল হামীদ বিন সিদ্দীক হুসাইন।

প্রকাশকালঃ প্রথম প্রকাশঃ

আরবীঃ জিলহজ্জ, ১৪৩৪ হিজরী।

ইংরেজীঃ নভেম্বর, ২০১৩ সাল।

বাংলাঃ কার্তিক, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

মূদ্রিত সংখ্যাঃ পাঁচ হাজার কপি মাত্র।

প্রকাশকঃ ইসলামিক দা'ওয়াহ সেন্টার,

খামিস মোশাইত, সউদী আরব।

সূচী পত্র ঃ فهرس الكتاب:

تقريظ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله إمام الدعاة وسيد المرسلين أما بعد:

فقد اطلعت على كتاب (حقائق الإسلام) باللغة البنغالية من أوله إلى آخره الذي قام بإعداده فضيلة الأخ /عبد الحميد صديق حسين وفقه الله، الداعية بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط ، وقد تبين لي أن الكتاب يمتاز بما يلي :

١- أن الكتاب سليم العقيدة وفق منهج السلف الصالح .
٢- أن هدف الكتاب بيان مفهوم وحقائق الإسلام فهما صحيحاً .
٣- أن محتويات الكتاب كلها مدللة بالكتاب والسنة والموعظة الحسنة بأسلوب مميز
٤- أن لغة الكتاب سهلة وميسرة ومفهومة ومناسبة للجالية البنغالية .
٥- أن عرض الكتاب مرتب ، فأرى أن الكتاب مناسب جداً للنشر والتوزيع .

وأخيراً أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وعامة المسلمين بهذا الكتاب وأن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين .

راجعه/ أخوكم في الله :
محمد سيف الاسلام خان المدني
خريج الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
الداعية / بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بخميس مشيط
المملكة العربية السعودية .

التاريخ :١٤٣٢/١١/٢٣هـ

বাণী ঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সত্যবাদী পথ প্রদর্শক, দাঈগণের ইমাম, শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ﷺ এর উপর। অতঃপর, আমি বাংলা ভাষায় রচিত "ইসলামের বাস্তবতা" নামক বইটির আদ্যপান্ত পাঠ করেছি। বইটি প্রণয়ন করেছেন আমার বন্ধুবর শাইখ, আব্দুল হামীদ বিন সিদ্দীক হুসাইন অফ্‌ফাক্বাহুল্লাহু। যিনি খামিস মোশাইত ইসলামিক দা'ওয়াহ্‌ সেন্টার, সৌদি আরবে দাঈর কাজে নিয়োজিত আছেন। আমি তাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। বইটি সালাফগণের বিশুদ্ধ আক্বীদার আলোকেই রচিত হয়েছে। বইটিতে ইসলামের বাস্তবতার উপর দলীল ভিত্তিক মৌলিক কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। বইটির ভাষা ও শব্দ বিন্যাস অত্যান্ত চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। তাই সাধারণ মানুষ ও জ্ঞান চর্চাকারী ছাত্রদের জন্য তা বুঝতে সহজ হবে। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি। পাশাপাশী বইটির সংকলকের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন তাঁকে দীর্ঘায়ূ দান করেন এবং লেখনীর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া ঘুমন্ত মুসলিম জাতির খিদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করেন। 'হে আল্লাহ ! তুমি আমাদেরকে তোমার সঠিক পথে কায়েম রাখ এবং আমাদের ইহকাল ও পরকাল শান্তিময় কর। আমীন !

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম খান মাদানী
লিসান্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
অনুবাদক ঃ ইসলামিক দা'ওয়াহ্‌ সেন্টার
খামিস মোশাইত, সউদী আরব।

তারিখ ঃ ২১ শে অক্টোবর- ২০১১ ইংরেজী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

اَلْمُقَدِّمَةُ

اَلْحَمْدُ لِلٰهِ الْوَاحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدْ ، اَلَّذِيْ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىَ خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ رَسُوْلِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىَ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ ، أَمَّا بَعْدُ :

ভূমিকাঃ

প্রশংসা মাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। যিনি এক, একক, অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারো কাছ থেকে জন্ম নেননি, যার কোন সমকক্ষ নেই এবং যিনি মানুষকে তাই শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। সালাত ও সালাম পেশ করছি আমাদের শেষ ও বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার পরিজন এবং তাঁর সকল সাহাবা বৃন্দের উপর। অতঃপর, আমি একটি কারণকে সামনে রেখে এই বইটি লেখা শুরু করি আর তা হলো ঃ বর্তমান সমাজের অনেক মানুষ ইসলামকে একটি সন্ত্রাসী ধর্ম বলে মনে করছে যা থেকে তা পুত-পবিত্র। যাঁরা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলছে তাদের অনেককেই আবার জঙ্গিবাদের অপবাদ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু হ্যাঁ, অনেকেই আবার ইসলামী লেবাস ধারণ করে ইসলামের ছাঁয়াতলে অনৈসলামিক কার্যকলাপ এবং মানুষ হত্যার মতো জঘণ্য অপরাধে লিপ্ত হয়ে থাকে যা ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। কেননা ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়ের ধর্ম। মানুষ ইসলামের তাৎপর্য ও বাস্তবতা না জানার কারণেই বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে থাকে। তাই আমি মহান আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলার উপর ভরসা করে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নিকট তাওফীক কামনা করে **"ইসলামের বাস্তবতা"** নামক বইটি লেখা শুরু করি এবং যথারীতি তা শেষও করি আল-হামদু লিল্লাহ। আমি বইটির মধ্যে পবিত্র কুরআন ও সহীহ

হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামকে উপলব্ধি করার কিছু মূল বিষয়াদী ও তার শাখা প্রশাখা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি মাত্র। পুস্তকটির বিষয় গুলির মধ্যে থাকছে ঃ ইসলামই আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন, ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে ঘৃণা করে, ইসলামের তিনটি মূলনীতি, ঈমানের সংজ্ঞা, ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ এবং মুক্তি প্রাপ্ত দলের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা। আমি বইটির বিষয়বস্তু গুলিকে শিরনাম আকারে উপস্থাপন করেছি যাতে করে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণ তা সহজে বুঝতে পারেন। আর সাথে সাথে আমি বইটির সঠিকতার দিকেও বিশেষ খেয়াল রেখেছি তার পরেও ভূল হওয়া কোন বিচিত্র বিষয় নয়। ‘হে আল্লাহ! আমার অজান্তে যে সব ভূল ভ্রান্তি হয়ে গেছে সে গুলিকে তুমি ক্ষমা করে দাও এবং আমার সঠিক গুলিকে তুমি কবুল করে নাও!। সাথে সাথে সুহৃদয় পাঠক/ পাঠিকাগণের নিকট আমার আকুল আবেদন, আপনাদের দৃষ্টিতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা আমাকে জানাতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। সে জন্য আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তিতে তা সংশোধনের প্রাণপণ চেষ্টা চালাব ইন্‌শা আল্লাহ।

বইটি সংকলনে যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সু-পরামর্শ, পর্যালোচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে অত্র অফিসের দাঈঃ **জনাব শাইখ সাইফুল ইসলাম খাঁন মাদানী সাহেবের** জন্য আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দো’আ করছি এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সাথে সাথে বইটির সম্পাদনার ক্ষেত্রে যিনি তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয় **শাইখ, জনাব আব্দুন নূর বিন আব্দুল জব্বার সাহেব,** দাঈ ইসলামিক সেন্টার রাবওয়া, রিয়াদ। তাঁরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি মহান আল্লাহ যেন তাঁকেও উত্তম পূরষ্কার দান করেন। আমি অন্যান্য সুপরামর্শদাতা দাঈ ভাইদের যেমন **শাইখ হাফেজ আনোয়ারুল ইসলাম,** দাঈ আহাদ রুফাইদা ইসলামিক সেন্টার ও **শাইখ আব্দুস সালাম আব্বাস আলী,** দাঈ জাহরান জুনুব ইসলামিক সেন্টার তাঁদের জন্যও মহান আল্লাহর কাছে দু’আ করছি তিনি যেন তাঁদের সকলকেই জাযায়ে খায়ের দান করেন, আমীন !। আমি আরও গভীর শ্রদ্ধার

সাথে স্বরণ করছি খামিস মোশাইত ইসলামিক দা'ওয়াহ্ সেন্টারের সম্মানিত প্রধান ডাইরেক্টর ও আবহা কিং খালেদ ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগের সাবেক ডীন, **জনাব ঃ প্রফেসার ডক্টর আব্দুল্লাহ্ বিন হাদী আল কাহ্তানীকে** এবং অত্র অফিসের শায়েখ-মাশায়েখ ও অন্যান্য দাঈগণকেও। কেননা তাঁরা বইটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্ তাঁদেরকেও উত্তম পূরষ্কারে ভূষিত করুক, আমীন!।

'হে আল্লাহ্ তুমি আমার এ খেদমতটুকু কবুল করে নাও এবং বইটির মাধ্যমে আমাকে ও সম্মানিত পাঠক/পাঠিকাগণকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দাও এবং এর মাধ্যমে আখেরাতে আমাকে ও আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা ও যার অক্লান্ত পরিশ্রমে আমার লেখা পড়া জীবনের হাতে খড়ি তিনি আমার **শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব, হাফেজ মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম** সহ অন্যান্য উস্তাদমন্ডলী ও গুরুজনকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। আর ইহাকে আমাদের নাজাতের অসীলা বানিয়ে দাও, আমীন! ছুম্মা আমীন!। অআখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। অসাল্লাল্লাহু অসাল্লামা আ'লা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ অআলা আলিহি অআসহাবিহি আজমাঈন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

গ্রন্থকার

আব্দুল হামীদ বিন সিদ্দীক হুসাইন,

দাঈ বাংলা বিভাগ, ইসলামিক দা'ওয়াহ সেন্টার, খামিস মোশাইত, সউদী আরব।

গ্রাম ঃ সারাই বালার ঘাট, পশ্চিম পাড়া, হারাগাছ পৌরসভা, এবং মধুবন হাউজিং, শালবন মিস্ত্রি পাড়া, হারাগাছ রোড, সিটি করপোরেশন, রংপুর, বাংলাদেশ।

তারিখ ঃ ৫ই জমাদিউল আখেরাহ -১৪৩২ হিজরী,

মোতাবেক ঃ ০৮/০৫/২০১১ ইংরেজী,

মোবাইল ঃ ০০৯৬৬-০৫০৮৪১৪৯৯৮

e-mail : abdulbdhamid@gmail.com

www.sattobani.wordpress.com

ইসলামের বাস্তবতা

ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থে ইসলামের সংজ্ঞা হচ্ছেঃ اَلْاِسْلَامُ (আল-ইসলাম) শব্দটি سِلْمٌ 'সিলমুন' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ঃ আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা, নির্দেশ মেনে নেয়া, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা, প্রশান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করা ইত্যাদি। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী হলোঃ

(فَإِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ) سورة آل عمران ٢٠

অর্থঃ "(হে রাসূল) অনন্তর তারা যদি তোমার সাথে বিতর্ক করে তবে তুমি বল ঃ আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই আত্মসমর্পণ করেছি"। (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত নং ২০)

পারিভাষিক অর্থে ইসলামের সংজ্ঞা হচ্ছে ঃ

(هُوَ الْاِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْاِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ)

তাওহীদ তথা একত্ববাদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা, শিরক ও মুশরিকদের থেকে মুক্ত থাকার নামই হলো ইসলাম। ইসলাম সম্পর্কে রাসূল ﷺ কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ

(أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ لِلَّهِ وَأَنْ تُوَلِّيَ وَجْهَكَ إِلَى اللهِ وَأَن تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ) مسند إمام أحمد

অর্থঃ“(ইসলাম হলোঃ) তোমার আত্মা যেন আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সমর্পিত হয়। আল্লাহর দিকেই যেন তোমার চেহারা ফিরিয়ে রাখো (অর্থাৎ-তাঁর কাছেই যেন আত্মসমর্পণ করে)। ফরয নামায আদায় করবে এবং ফরয যাকাত প্রদান করবে”। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ) অপর হাদীসে এসেছে, ইসলাম হলোঃ ‘আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিজ আত্মাকে সমর্পণ করা এবং নিজের হাত ও মুখের (অনিষ্ট) হতে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকা’। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ এবং মুহাম্মাদ বিন নাস্র আল মারওয়াযী)

অতএব, যে ব্যক্তি এগুলি স্বীকার করতঃ তা পালন করবে তাকেই মুসলিম বলা হবে। (দেখুনঃ আরবী বই ‘উসূলূস সালাসাহ’ ও “ফাযলূল ইসলাম” পুস্তিকার ৯ পৃষ্ঠা এবং বাংলা বই ‘মনোনীত ধর্ম’ ১৮ পৃঃ)

আল্লাহ তা’য়ালার নিকট মনোনীত দ্বীন ধর্ম

আল্লাহর নিকট ইসলামই হলো একমাত্র মনোনীত দ্বীন বা ধর্ম। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা’য়ালা নিজেই ঘোষণা করেন ঃ

(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) سورة آل عمران (١٩)

অর্থঃ “নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) দ্বীন”। (তথা ধর্ম) (সূরা আলে ইমরানঃ ১৯ নং আয়াত) তাই তো মহান আল্লাহ তা’য়ালা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে যে সব নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁদেরকেও এই দ্বীন ইসলামের উপর অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে ঃ

(وَوَصىَّ بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ) سورة البقرة : ١٣٢

অর্থঃ "আর ইব্রাহীম ও ইয়াকুব (عليه السلام) স্বীয় সন্তানগণকে সদুপদেশ প্রদান করেছিল যে, 'হে আমার সন্তান-সন্ততিঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে এই দ্বীন মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না"। (সূরা বাকারাহ্ ঃ ১৩২ নং আয়াত)

আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ কেও শেষ নবী রুপে এই সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন। যাতে করে অন্য সকল বাতিল ও রহিত দ্বীনের উপরে তা প্রাধান্য লাভ করে। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন ঃ

﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾ سورة الفتح : ٢٨

অর্থঃ "তিনি (আল্লাহ) তাঁর রাসূলকে পথ-নির্দেশ (তথা কুরআনের হেদায়েত) ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দ্বীনের উপর এটাকে জয়যুক্ত করার জন্য আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট"। (সূরা ফাতহ্ ঃ আয়াত নং-২৮)

তাই, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এই ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন-ধর্মকে গ্রহণ করবেন না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র ঘোষণা হচ্ছে ঃ

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) سورة آل عمران : ٨٥

অর্থ ঃ "আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন অন্বেষণ করে তা কখনই তাঁর নিকট হতে গৃহিত হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ্দের অর্ন্তভূক্ত হবে"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫ নং আয়াত)

অতএব, মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পছন্দনীয় দ্বীন হলো ইসলাম। আর দ্বীন ইসলাম গ্রহণ না করে অন্য ধর্মের উপর থাকা অবস্থায় কেউ

মৃত্যু বরণ করলে সে কখনই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না বরং সে অনন্তকাল আগুনে পুড়তে থাকবে।

তাই, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান এবং সকল অমুসলিম লোকদের প্রতি আমার আকুল আহবান হলো ঃ সবার উপর সত্য ধর্ম আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা মহান দ্বীন পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করুন এবং প্রকৃত মুসলিম হয়ে মৃত্যু বরণ করুন। তবেই আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব অন্যথায় নয়। কেননা তিনি এই দ্বীন ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন না এবং ইহাই হলো আল্লাহর চুড়ান্ত অঙ্গীকার।

ইসলামই মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণ দ্বীন

দ্বীন ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণ দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা। এতে সকল মানব জাতীর জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রয়েছে এর প্রমাণ হচ্ছে, মহান আল্লাহ তা'য়ালার বাণী ঃ

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) سورة المائدة : ٣

অর্থঃ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম। আর তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদাহঃ ৩ নং আয়াত) উক্ত আয়াত থেকে আমরা অবগত হলাম যে, পবিত্র দ্বীন ইসলামকে দিয়েই মুহাম্মাদ ﷺ কে আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন। ইহাই হলো পরিপূর্ণ দ্বীন কারণ এ দ্বীন সকল উম্মত, যুগ ও স্থানের জন্য প্রযোজ্য। ইহা নারী-পুরুষ, মানব-দানব সকলের জন্য সহজ সরল ও মধ্যম পন্থী ধর্ম। যা ন্যায়, ইনসাফ, কল্যাণ, দয়া, অনুগ্রহ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও মুক্তির আহব্বান জানায়।

এর অনুসরণের মাধ্যমেই সঠিক ও সত্য পথের সন্ধান পাওয়া যায়। যেহেতু এ দ্বীন ইসলাম ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিয় এবং আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালনার জন্যে সকল দিক ও পথের নিয়ম ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে থাকে। এমনকি অমুসলিম বন্দি, চুক্তিবদ্ধ বৈদেশিক ও বিধর্মীদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হয় তার শিক্ষাও এই দ্বীন ইসলামে বিদ্যমান। তাই এই দ্বীন ইসলামই হলো মানব জীবনের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং একটি শক্তিশালী মাইল ফলক ও সংবিধান। ('দ্বীনুল হক্ব' গ্রন্থের ৩২-৩৫ পৃঃ) আমরা রাসূল ﷺ এর বাণীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে এর সমর্থনে আরও প্রমাণ পাই। যেমন তিনি এরশাদ করেছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلاَثاً قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ وَالتِّرْمِذِيُّ ١٩٢٦ وَأَبُوْدَاوُدُ ٤٩٤٤)

অর্থঃ নবী ﷺ তিনবার বলেছেনঃ দ্বীন (ইসলাম) হলো সত্য ও হক্বের উপদেশ প্রদান করা। আমরা (সাহাবীরা) আরজ করলাম কার জন্য? তিনি উত্তরে বললেনঃ (উপদেশ হবে) আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতাদের জন্য এবং সর্ব সাধারণের জন্য। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি-১৯২৬ এবং আবু দাউদ-৪৯৪৪ নং হাদীস)

উক্ত হাদীসটিতে *আল্লাহর জন্য উপদেশ* বলতে বুঝায়ঃ একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা, তাতে কোন প্রকার ধোকাবাজির আশ্রয় না নেয়া।

তাঁর কিতাবের জন্য উপদেশ বলতেঃ পবিত্র কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করে সে অনুযায়ী আমল করাকে বুঝানো হয়ে থাকে।

নবীর জন্য উপদেশ বলতেঃ তাঁর প্রতি ঈমান নিয়ে এসে তাঁর আনুগত্য করা এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করাকে বুঝানো হয়ে থাকে।

মুসলিম নেতাদের জন্য উপদেশ বলতেঃ তাদেরকে সঠিক পরামর্শ দেয়া এবং তাদের কোন ভূল পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন করানোর চেষ্টা করতে থাকা।

এবং সর্ব সাধারণের জন্য উপদেশ বলতেঃ মুসলমানদের উপর সহৃদয়বান হওয়া, তাদের সুখে দুঃখে অংশ গ্রহণ করে তাদের কল্যাণের জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা চালানোকেই বুঝানো হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, দ্বীন ইসলাম সকল মানুষের কল্যাণের জন্যই প্রযোজ্য। তাই এই দ্বীন অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে একটি পবিত্র কিতাব আল কুরআনুল কারীম দান করেছেন এবং তাতে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা এই ইসলামের ভিতরে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর, আর তা ছেড়ে দিয়ে শয়তানের পথ অবলম্বন করো না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
سورة البقرة : ٢٠٨ـ ٢٠٩

অর্থঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণরুপে ইসলামে প্রবেশ কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর তোমাদের নিকট স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদী আসার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হয়ে যাও, তবে জেনে রেখ যে, আল্লাহ হচ্ছেন মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়"। (সুরা বাকারাহ ঃ২০৮ ও ২০৯ নং আয়াত)

আর আল্লাহ তা'য়ালা সেই স্পষ্ট দলীল বা ঐশী বাণীর শিক্ষকরুপে পাঠিয়েছেন বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ ﷺ কে। তাই তো প্রিয় রাসূল ﷺ বলেছেনঃ "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি (১) আল্লাহর কিতাব (কুরআনুল কারীম) (২)

আমার সুন্নাত (হাদীস) তোমরা এ দু'টিকে হাতে, দাঁতে মজবুতভাবে আকঁড়ে ধরলে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না"। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক ঃ ৩৩৩৮ নং হাদীস)।

অনুরুপ আর একটি হাদীসঃ একদা নবী ﷺ এক উচ্চাঙ্গময় ভাষণে বললেনঃ "আমার পর তোমরা অনেক রকম মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব, তোমাদের উচিত আমার ও আমার সুপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। তা তোমরা দৃঢ়তার সাথে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং দ্বীনের ভিতরে সকল নবরচিত কর্ম থেকে সাবধান থাকবে! কেননা প্রত্যেকটি বিদআ'ত (নতুন আমলই) হলো ভ্রষ্টতা। (ইবনে মাযাহঃ ৪২ নং হাদীস এবং আবু দাউদ ও তিরমিযি।)

অতএব, দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে আমাদের উচিতঃ এই দ্বীন ইসলামেরই একমাত্র অনুসারী হওয়া এবং সে অনুযায়ী আমাদের জীবনের সকল ইবাদত ও কর্ম পরিচালনা করা। কারণ এই দ্বীন মানব-দানব সকল জাতির জন্য পরিপূর্ণ ধর্ম। এই দ্বীনের মধ্যে কোন সংযোজন ও বিয়োজন করার সুযোগ নেই। যেহেতু রাসূল ﷺ সকল প্রকার ভাল কাজের কথা বলে দিয়েছেন এবং যত খারাপ ও মন্দ কাজ আছে তা থেকে আমাদেরকে সাবধান করে গেছেন। তাই, আমাদের উচিত মহান আল্লাহকে ভয় করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর সুন্নাতের অনুসারী হওয়া ও প্রকৃত মুসলিম হয়ে ইহজগত ত্যাগ করা। 'হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দ্বীন ইসলাম মোতাবেক জীবন যাপন করার তাওফীক দান কর' এবং এর উপরই মৃত্যু দান কর। আমীন !

ইসলাম, সন্ত্রাসবাদ ও মানব হত্যা

ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইহা মানুষের মাঝে নিরাপত্তা বিস্তার করারই গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। ইসলাম কখনই সন্ত্রাসবাদে ও অহেতুক মানব হত্যায় বিশ্বাস করে না। কারণ মানুষের মর্যাদা আল্লাহর নিকট খুবই বেশী। এমনকি কোন কাফেরকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করা ইসলামী বিধান মোতাবেক বৈধ নয়। বরং একজন মানুষকে হত্যা করা মানে সকল মানুষকে হত্যা করা। তেমনিভাবে কোন মানুষকে হত্যা থেকে রক্ষা করাই হলো সকল মানুষকে জীবিত রাখার শামিল। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) سورة المائدة : (٣٢)

অর্থঃ "এ কারণেই আমি বানী ইসরাঈলের প্রতি এ নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলো অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত কিংবা তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে কোন ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেললো; আর যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করলো সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করলো"। (সুরা মায়িদাহঃ ৩২ নং আয়াত)

অনুরুপভাবে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনাকারী এবং অন্যায় ভাবে কোন মু'মিন, মুসলিম, শিশু, নর-নারীকে হত্যাকারীর শাস্তির বিধান মহান আল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন। এর অসংখ্য দলীল রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) سورة المائدة : ٣٣

অর্থঃ “যারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে, আর ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা বিপরীতমুখী হাত-পা (এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা) কেটে ফেলা হবে, অথবা ভূ-পৃষ্ঠ (নিজ এলাকা) হতে বের করে দেয়া হবে। ইহা তো দুনিয়াতে তাদের জন্যে চরম অপমান, আর পরকালেও তাদের জন্যে ভীষণ শাস্তি রয়েছে”। (সুরা মায়িদাহ ঃ ৩৩ নং আয়াত)

মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) سورة النساء : ٩٣

অর্থঃ “আর যে কেউ স্বেচ্ছায় কোন মু’মিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেথায় সে সর্বদাই অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ এবং তাকে অভিশপ্ত করেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন ”। (সুরা নিসা ঃ ৯৩ নং আয়াত)। এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবী ﷺ এর বাণী হলো ঃ

(لَن يَّزَالَ الْمُؤْمِنُ فِيْ فُسْحَةٍ مِّنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) البخاري

অর্থঃ “একজন মু’মিন ব্যক্তি ততক্ষণ দ্বীনের ব্যাপারে আজাদ থাকে, যতক্ষণ না সে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করে”। (বুখারী হাদীস নং৬৮৬২)

অন্য হাদীসে এসেছে নবী ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে এরশাদ করেছেন ঃ

(فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ قَالَ : اَللَّهُمَّ اشْهَدْ) متفق عليه

অর্থঃ “আজ এই পবিত্র দিনে, পবিত্র মাসে এবং এই পবিত্র (মক্কা) শহরে তোমাদের জন্য যেমন (যুদ্ধ বিগ্রহ ও অপকর্ম করা) অবৈধ, তেমনিভাবে তোমাদের জান ও মালও বিনষ্ট করা অবৈধ। (অর্থাৎ-তোমরা কেউ কারো জান ও মালের ক্ষতি সাধন করবে না) যতদিন পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রভূর

সাক্ষাত করবে। আমি কি আমার দায়িত্ব পৌছে দিলাম? সাহাবাগণ বললেনঃ হ্যাঁ-(পৌছে দিলেন) তিনি বললেনঃ ‘‘হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষ্যি থাক”। (বুখারী-১৭৪১ এবং মুসলিম ১৬৭৯ নং হাদীস)

অতএব, আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে, ইসলাম কখনই সন্ত্রাসবাদ ও অহেতুক মানব হত্যার অনুমতি প্রদান করে না বরং ইসলামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা ও অবৈধ হত্যা করাকে হারাম করা হয়েছে।

তাই, ইসলাম সর্বদাই মানুষের নিরাপত্তা বিধানের জন্য শান্তির পক্ষেই কথা বলে। ইহা কখনো সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করার অনুমতি দেয় না বরং ইসলামে এসব কর্ম কান্ডকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই সন্ত্রাসবাদের সাথে ইসলামের সামান্যতমও কোন বিন্দু পরিমাণ সম্পর্ক নেই।

ইসলামে পাঁচটি বিষয়ের সংরক্ষণ

মানব জীবনে উপকারী সকল বিষয়কে সংরক্ষণ করার জন্য ইসলাম আদেশ করেছে। বিশেষ ভাবে মৌলিক পাঁচটি বিষয়ের হিফাযত করা সম্পর্কে ইসলামে যে জোর তাকিদ এসেছে সেগুলি হলোঃ

(ক) দ্বীন-ধর্মের হিফাযত করা। অর্থাৎ-সকল কাজের পূর্বে দ্বীন ইসলামের হিফাযত করাকেই প্রাধান্য দিতে হবে এবং ইসলামের গন্ডির ভিতরে থেকেই যাবতীয় কাজ করতে হবে। কেননা এই দ্বীন ইসলামের বাহিরে কেউ যদি অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা তার নিকট থেকে কবুল করা হবে না। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) سورة آل عمران : ٨٥

অর্থ ঃ "আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন অন্বেষণ করবে তা কখনই তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অর্ন্তভূক্ত হবে"। (সুরা আল ইমরানঃ ৮৫ নং আয়াত)। অতএব, এই দ্বীন ইসলামের হিফাযত করা প্রত্যেকের অপরিহার্য ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(খ) জানের হিফাযত করা। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)

অর্থঃ "আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না"। (সুরা নিসা ঃ ২৯ নং আয়াত) অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة (١٩٥)

অর্থঃ "আর তোমরা স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করো না"। (সুরা বাকারা ১৯৫ নং আয়াত)। তাই, আমাদের উচিত নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং তা হিফাযত করা।

(গ) জ্ঞান-বুদ্ধি তথা মস্তিষ্কের হিফাযত করা। অর্থাৎ-নিজ জ্ঞানকে সদা সর্বদাই হক্বের পথে ব্যয় করা এবং বাতিল থেকে দূরে রাখা। সাথে সাথে স্বীয় জ্ঞানকে বিকৃতি হওয়া থেকে হিফাযত করা। আর এই মস্তিষ্কের হিফাযত হয় যাবতীয় মাদক ও নেশাকর বস্তু তথা মস্তিষ্ক বিকৃত করে এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এমন সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করা থেকে বাঁচার মাধ্যমে। কেননা ইসলামে এ ধরণের যাবতীয় বস্তুকেই হারাম করা হয়েছে। নেশাকর বস্তু গ্রহণ করা হলো কবীরা গুনাহের অর্ন্তভূক্ত, তা কম হোক বা বেশী হোক। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

(مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ) أبو داوود والترمذي والنسائي

অর্থঃ রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন ঃ "কোন বস্তুর অধিক পরিমাণ (পান করলে) যদি মাতাল হয়, তাহলে তার সামান্যতমও (পান করা) হারাম"। (আবু দাউদ ৩৬৮১ নং, তিরমিযি-১৮৬৫ নং ও নাসাঈ-৫৬০৭ নং হাদীস) তেমনি ভাবে মদ পান করা, হাশীশ (এক ধরনের মাদকদ্রব্য) তা পান করাও হারাম। বর্তমান

বিশ্বে মদের মতো আরও কিছু নেশাকর বস্তু আছে যে গুলির শুধু নাম পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র যেমনঃ ফেনসিডিল, আফিং, প্যাথিডিন, বিয়ার, হুইস্কি, ব্যারিন্ডি, রম, গাজা, হিরোইন, ইয়াবা ট্যাবলেট, ইত্যাদি, এগুলির ব্যবহার পরিহার করার মাধ্যমে নিজের মস্তিষ্ককে হিফাযত বা সংরক্ষণ করা সম্ভব। যেহেতু এগুলিকে ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাই সেগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা কেউ মাদকাশক্ত হলেই তার মধ্যে অপকর্ম করার প্রবনতা দেখা দেয়। তথা নেশাই হলো সকল অপকর্মের মূল চাবিকাঠি।

(ঘ) মান-সম্মানের হিফাযত করা। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

(كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অর্থ ঃ “প্রতিটি মুসলিমের উপর তার অপর মুসলিমমের জান, মাল ও সম্মান নষ্ট করা হারাম তথা অবৈধ। অর্থাৎ তা রক্ষা করা উচিত। (মুসলিম ঃ ২৫৬৪ নং হাদীস) উক্ত হাদীসে মান-সম্মান ও মর্যাদার সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঙ) মালের হিফাযত করা। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ আর্থিক ক্ষতি করতে প্রিয় নবী ﷺ নিষেধ করে বলেছেন ঃ

(إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِضَاعَةَ الْمَالِ) متفق عليه

অর্থঃ “আল্লাহ তোমাদের উপর মালের ক্ষতি সাধন করা হারাম করেছেন”। (বুখারী ঃ ২৪০৮ নং মুসলিমঃ ১৭১৫ নং হাদীস)

অতএব, উপরোক্ত বস্তু গুলির প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়ার জন্য এবং সেগুলিকে হিফাযত করার জন্য ইসলামে জোর তাকিদ এসেছে। তাই আমাদের উচিত এগুলির যথাযথ হিফাযত করা এবং সেগুলির সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হওয়া।

প্রত্যেক মুসলমানকে চারটি বিষয়ের জ্ঞান রাখা খুবই জরুরী

ইসলামী জীবন পরিচালনার জন্য প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব হলো চারটি বিষয়ের জ্ঞান রাখা যথা ঃ

(১) ইল্‌ম বা জ্ঞানার্জন করা ঃ আর এই ইল্‌ম তথা জ্ঞান রাখতে হবে দলীল ভিত্তিক তিনটি বিষয়ের ঃ

(ক) মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা ।

(খ) বিশ্ব নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।

(গ) আর দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।

কেননা মানুষ মৃত্যু বরণ করলে বা কবরস্থ হলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার কাছে দু'জন ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে তাকে সর্ব প্রথম এই তিনটি প্রশ্নই করবেন, এগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে পেশ করবো ইন্‌শা আল্লাহ।

(২) সেই ইল্‌ম বা জ্ঞান অনুযায়ী আ'মল করা।

(৩) তার দিকে অন্যদেরকে আহব্বান করা।

(৪) আহব্বানের পথে বাধা বিপত্তি ও কষ্ট আসলে তাতে ধৈর্য্য ধারণ করা।

উপরোক্ত কথা গুলির দলীল হলো ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালার নিম্নোক্ত বাণী ঃ

(وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)) سورة العصر

অর্থঃ "সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অপরকে ধৈর্য্য ধারণে উদ্বুদ্ধ করেছে"। (সুরা আসরঃ ১-৩ নং আয়াত)

ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত সুরাটি প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "আল্লাহ তা'য়ালা যদি পৃথিবী বাসীর জন্য এই সুরা আসরটি ব্যতীত আর অন্য কোন সুরা অবতীর্ণ না করতেন তা হলে ইহাই তাদের (আমলী জিন্দেগী পরিচালনার) জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত"।

অতএব, ইসলামী জীবন পরিচালনার জন্য উক্ত বিষয় গুলির পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা খুবই জরুরী বিষয় ও আমাদের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইসলামের মূলনীতি কয়টি ?

ইসলামের মূলনীতি হলো তিনটি যথা ঃ

(ক) মহান আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।

(খ) বিশ্ব নাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।

(গ) আর দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।

অর্থাৎ- এমন তিনটি মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান রাখা, যার স্বরুপ সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রতিটি মানুষের জন্য বিশেষ করে, মুসলিম মিল্লাতের জন্য তার জ্ঞান রাখা আরও অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা মানুষ মৃত্যু বরণ করলে বা কবরস্থ হলে আল্লাহ তা'য়ালা তার কাছে দু'জন ফেরেশ্তা পাঠিয়ে তাকে এই তিনটি

মূলনীতি সম্পর্কেই সর্ব প্রথম প্রশ্ন করবেন। তাই, এগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এখন নিম্নে পেশ করবো ইন্‌শা আল্লাহ।

প্রথম মূলনীতি ঃ আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা

আপনার প্রভূ কে ?

আমার প্রভূ মহান আল্লাহ। যিনি আমাকে এবং সকল পৃথিবীবাসীকে তাঁর বিশেষ নি'য়ামত রাজি দ্বারা প্রতিপালন করছেন। তিনিই আমার একমাত্র মা'বুদ। তিনি ব্যতীত আমার আর কোন সত্য উপাস্য নেই। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক"। (সুরা ফাতিহাঃ আয়াত-১) আল্লাহ মহান তাঁর ক্ষমতা অসীম, আর মানুষের ক্ষমতা সসীম। তিনি আমাদের ভাল-মন্দ করার মালিক, তিনি আরশে আযীমে সমুন্নত। মহান আল্লাহ জান্নাতে ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে তিনি দেখা দিবেন। তাঁর অসীম শক্তির কোন শেষ নেই, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। আর যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি অফুরন্ত নি'য়ামাতরাজী দান করে থাকেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে কিছুই দেন না, এ জন্য তাঁকে প্রশ্ন করার ক্ষমতাও কেউ রাখে না। এক কথায় তাঁর বর্ণনা লিখে শেষ করার মতো নয়। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

(قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا) سورة الكهف ١٠٩

অর্থঃ "(হে রাসূল) আপনি বলুন ঃ আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাহায্যার্থে যদিও এর মতো অন্য আর একটি (সমুদ্র) কালির জন্য আনয়ন করি"। (সুরা কাহাফ ঃ আয়াত ১০৯ নং আয়াত)

অতঃএব, মহান আল্লাহকে ভয় করে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা, তাঁর কাছেই আমাদের যাবতীয় আবেদন নিবেদন পেশ করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা আল্লাহই আমাদের একমাত্র পালনকর্তা ও ইবাদত পাওয়ার যোগ্য হক্বদার।

প্রভূকে চিনার উপায় কি?

আমি আমার প্রভূকে তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর সৃষ্টিকূলের মাধ্যমে চিনতে পারি। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে হচ্ছেঃ চন্দ্র, সূর্য, রাত, দিন ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

(وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) السجدة ٣٧

অর্থ ঃ "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সিজদা করো আল্লাহকে, যিনি এই গুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর"। (সুরা হা-মীম আস সিজদাহ ৩৭নং আয়াত)। আর আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিকূলের মধ্যে রয়েছে ঃ সপ্তাকাশ, সাত যমীন ও এর মধ্যেকার যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্ররাজী। এ গুলির মাধ্যমেও আমি আমার প্রভূকে চিনতে পারি, জানতে পারি। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) الأعراف : ٥٤

অর্থঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উর্ধ্বে অবস্থিত হয়েছেন, তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদন করেন, (ফলে) ওরা দ্রুত গতিতে একে অন্যের অনুসরণ করে চলে, সূর্য,চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সবই তাঁর আদেশের অনুগত। জেনে রাখো, সৃষ্টি এবং আদেশের মালিক একমাত্র তিনিই, সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহই হলেন মহা কল্যাণময়"। (সুরা আ'রাফ ঃ ৫৪ নং আয়াত)

উপরোক্ত বস্তু গুলি যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই ইবাদত পাওয়ার একমাত্র হকদার। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেন ঃ

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢))

অর্থঃ "হে মানব মন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা মুত্তাকী হও (আল্লাহর আযাব হতে বাচঁতে পার)। যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ স্বরুপ করেছেন এবং যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য জীবিকা স্বরুপ ফলফলাদী উৎপাদন করেন। অতএব, তোমরা জেনে শুনে আল্লাহর জন্যে শরীক স্থির করো না"। (সুরা বাকারা ঃ ২১-২২ নং আয়াত)

আপনার প্রভূর পরিচয় কি ?

আমার প্রভূ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা। তিনি এক, একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন স্ত্রী নেই, তাঁর কোন ছেলে-মেয়ে বা সন্তানাদী ও অন্য কোন আত্নীয়-স্বজন নেই, এ ধরণের সকল বস্তু হতে তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি অপরিসীম মহাশক্তিধর এবং একচ্ছত্র পরিচালক ও ইহ-পরজগতের মালিক। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর পরিচয় সম্পর্কে নবী ﷺ কে জানিয়ে বলেন ঃ

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤))

অর্থঃ "বলুনঃ তিনিই আল্লাহ এক, (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, (সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকে জন্ম দেননি; এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। (অর্থাৎ-তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন)। এবং কেহই তাঁর সমতুল্য নয়"। (সুরা ইখলাস)। তাছড়াও পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীর কথা বর্ণিত হয়েছে। যেখানে যেভাবে তাঁর নাম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সে গুলির উপর ঠিক সেভাবেই ঈমান নিয়ে আসা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাতে কোন প্রকার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন, তুলনা, উপমা, উদাহরণ দেয়া যাবে না। কেননা তাঁর সাদৃশ্য কোন বস্তুই নেই। এই হলো মহান আল্লাহর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

আল্লাহ্ তা'য়ালার সত্তার প্রমাণ

অনেকে মনে করেন যে, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা সত্তাহীন (নিরাকার তথা তাঁর কোন সত্তা নেই, তাঁকে দেখা যাবে না) কিন্তু পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বিচার করলে আমরা জানতে পারি যে, এ বিশ্বাস সঠিক নয় বরং

আল্লাহর সত্তা রয়েছে এবং তিনি অসংখ্য সিফাতে তথা গুণে বিশেষিত তাঁকে সত্তাহীন ভাবা কখনই উচিত নয়। আল্লাহর নিজস্ব সত্তা রয়েছে, তা মনে প্রাণে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু তার স্বরুপ বর্ণনা করা, তাঁর বৈশিষ্ট্য ও সত্তা কিসের মতো, কার মতো, কেমন, তাঁর রুপ, আকৃতির তুলনা, উপমা, উদাহরণ দৃষ্টান্ত ইত্যাদি বর্ণনা করা কখনই বৈধ নয়। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) سورة الشورى (١١)

অর্থঃ "কোন বস্তুই তাঁর মতো নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। (সুরা আশ্ শুরা ঃ ১১ নং আয়াত)। মহান আল্লাহ যে সত্তাহীন নন বরং তাঁর বহু সিফাত তথা গুণ রয়েছে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে ঃ যেমন মহান আল্লাহ তাঁর চেহারার কথা উল্লেখ করে বলেনঃ (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) سورة الرحمن

অর্থঃ "আর শুধু তোমার প্রতিপালকের চেহারা (স্বীয় সত্তা) অবশিষ্ট থাকবে, যা মহিমাময়, মহানুভব"। (সুরা আর রহমান ঃ ২৭ নং আয়াত)

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

(وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) سورة القصص (٨٨)

অর্থঃ "আর তুমি আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদের ইবাদত করো না, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) মা'বুদ নাই। একমাত্র আল্লাহর চেহারা (স্বীয় সত্তা) ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল। অকাট্য ফয়সালা তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে"। (সুরা কাসাস ঃ ৮৮ নং আয়াত)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলীর মধ্যে হলো তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব সত্তার স্বীকার করা, যে গুলির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাই সে গুলিকে বিশ্বাস করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব এবং এ গুলিকে অস্বীকার করা কুফরী।

আল্লাহর সাদৃশ্যহীন দুই হাতের প্রমাণ

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ) ص٧٥

অর্থঃ "তিনি (আল্লাহ্) বলেন ঃ হে ইবলীস, আমি যাকে নিজ দু'হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিলো ? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না কি তুমি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন"। (সুরা সোয়াদ ঃ ৭৫ নং আয়াত) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ আরও বলেনঃ

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ) سورة المائدة (٦٤)

অর্থ ঃ "আর ইয়াহুদীরা বলে আল্লাহর হাত বাঁধা আছে। তাদেরই হাত বন্ধ এবং তাদের এই সব উক্তির দরুন তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, বরং তাঁর (আল্লাহর) দুই হাতই উন্মুক্ত, তিনি যে ভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন"। (সুরা মায়িদাহ ঃ ৬৪ নং আয়াত) উপরোক্ত আয়াত গুলি থেকে মহান আল্লাহর সাদৃশ্যহীন দুই হাতের প্রমাণ পাওয়া যায়, যা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো নেই।

আল্লাহর শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির প্রমাণ

মহান আল্লাহ্ তাঁর শ্রবণশক্তি প্রসঙ্গে বলেনঃ

(قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) سورة المجادلة (١)

অর্থঃ (হে রাসূল ﷺ)"আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথোপকথোন শুনেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। সুরা মুজাদিলাঃ ১নং আয়াত। (এ বিষয়ে আরও অতিরিক্ত আলোচনা দেখুন ঃ সুরা আল ইমরান ঃ ১৮১ নং আয়াত, সুরা ত্বাহা ঃ ৪৬ নং আয়াত এবং সুরা আয্-যুখরুফ ঃ ৮০ নং আয়াত) এভাবে তাঁর শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে আরও অনেক দলীল আছে।

অতএব, এ গুলিকে অস্বীকার করা কারো উচিত নয়। মহান আল্লাহ তাঁর দৃষ্টিশক্তি প্রসঙ্গে বলেন ঃ

(وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (١٣) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ) (١٤) سورة القمر

অর্থঃ (নবী নূহ عليه السلام সম্পর্কে আল্লাহ বলেন) "তখন তাকে আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেক নির্মিত এক নৌযানে, যা চললো আমার চোখের সামনে, এটা পুরষ্কার তার জন্যে যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল"। (সুরা ক্বামার ঃ ১৩-১৪ নং আয়াত) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

(وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ) طور (٤٨)

অর্থঃ "তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছো। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে যখন তুমি কোন স্থান থেকে দন্ডায়মান হবে"। (সুরা তুর ঃ ৪৮ নং আয়াত) অন্যত্র আরও বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ বলেন ঃ

(وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) سورة طه ٣٩

অর্থঃ (আল্লাহ নবী মুসা عليه السلام এর প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা স্বরণ করে দিয়ে বলেন) "আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম,

যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও"। (সূরা ত্বাহাঃ ৩৯ নং আয়াত)

এ গুলিই হলো মহান আল্লাহর শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তির প্রমাণ। এ বিষয় গুলির প্রতি ঈমান রাখা আমাদের একান্ত দায়িত্ব।

আল্লাহ মহাপরিচালক ও চিরঞ্জিব তার প্রমাণ

মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির মহাপরিচালক ও চিরঞ্জিব, তিনি কখনো ঘুমান না, তাঁকে কোন প্রকার তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না এবং ইহা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। এই নভোমন্ডোল ও ভূমন্ডোলে যা কিছু আছে সবই তাঁর আয়ত্বাধীন। যেমন আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) سورة البقرة (٢٥٥)

অর্থঃ "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জিব, সকল সৃষ্টির মহা পরিচালক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডোলে যা কিছু আছে সব তাঁরই ; এমন কে আছে ? যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তিনি তাদের সামনের ও পিছনের সব কিছুই অবগত আছেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেউ আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কুরসি (তথা আল্লাহ তা'য়ালার কুরসিটি হলো তাঁর সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে একটি মহাসৃষ্টি, যা আল্লাহর আরশের সামনে অবস্থিত। তবে আরশটি কুরসি অপেক্ষা বড় এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه বলেছেন তা হচ্ছে আল্লাহর দু'পা রাখার স্থান)

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডোল পরিব্যপ্ত হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে ক্লান্ত হতে হয় না এবং তিনি সমুন্নত, মহীয়ান"। (সুরা বাকারাঃ ২৫৫ নং আয়াত) উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, মহিমাময় আল্লাহ তা'য়ালা সুউচ্চ স্থানে অনন্তকাল ধরে আছেন এবং থাকবেন। তাঁর কোন লয় ও ক্ষয় নেই, তিনি মহাশক্তিধর, তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই অপ্রকাশ্য, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং তিনিই আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালা।

মহান আল্লাহ কোথায় আছেন তার প্রমাণ

মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু সপ্তাকাশের উপর আরশে আযীমের উপরে সৃষ্টিজগতের উর্ধ্বে আছেন, তাঁর জন্য যেভাবে উপযুক্ত সেভাবেই তিনি আরশের উর্ধ্বে রয়েছেন। তিনি কিভাবে আরশের উর্ধ্বে আছেন তার কোন ধরণ ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করা যায়েজ নয়। ইহা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে, কারণ এ ব্যাপারে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। আর সারা পৃথিবীর ক্ষুদ্র থেকে বড় কোন বস্তুই তাঁর নিকটে গোপন নেই। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (٦) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (٧) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (٨)) سورة طه

অর্থ ঃ "দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উর্ধ্বে আছেন। আকাশ মন্ডলিতে ও পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের মাঝে ও ভূ-গর্ভে যা কিছু আছে এ সবই তাঁর। তুমি উচ্চ কণ্ঠে যা-ই বল, তিনি তো যা গুপ্ত ও অতি গোপন সবই জানেন। আল্লাহ তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) মা'বূদ নেই, অতি উত্তম নাম সমূহ তাঁরই"।

(সুরা ত্বা-হা ঃ ৫-৮ নং আয়াত) মহিমান্বিত আল্লাহ যে আরশের উর্ধ্বে আছেন তার আর একটি প্রমাণ হলো আল্লাহর এই বাণী ঃ

(هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) الحديد : ٤

অর্থ ঃ "তিনিই (আল্লাহ) ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উর্ধ্বে অবস্থিত হয়েছেন"। (সুরা হাদীদঃ ৪ নং আয়াত)

উপরোক্ত প্রমাণাদি থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, মহান আল্লাহ সপ্তাকাশের উপরে আরশে আযীমের উর্ধ্বে আছেন। তিনি সৃষ্টি জগত থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। তাঁর পবিত্র যাত বা সত্তা সৃষ্টিকূল থেকে আলাদা। তাই, আল্লাহ সকল স্থানের খবর রাখেন। কিন্তু তিনি সব জায়গায় তাঁর সত্তাসহ আছেন অথবা তিনি মানুষের অন্তরে থাকেন এ ধরণের বিশ্বাস রাখা কখনোই উচিত নয়। তবে তিনি আমাদের প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত আছেন। এমনকি তিনি আমাদের অন্তরের খবরও জানেন। অতএব, তিনি তাঁর সীমাহীন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে থাকেন।

আল্লাহ কিভাবে মানুষের নিকটে থাকেন তার প্রমাণ

মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহর ব্যাপারে কোন প্রকার উদাহরণ দেয়া বৈধ নয়। তবে আমি শুধু বুঝানোর জন্য একটি উদাহরণ পেশ করছি, আর তা হলো ঃ বর্তমান আধুনিক যুগে আমরা টেলিফোনে বা মোবাইলে অনেক দূরের মানুষের সাথে কথা বলার সময় বলে থাকি 'হ্যাঁলো! আমার সঙ্গে কে কথা বলছেন'? অথবা টেলিভিশনের পর্দায় কোন খবর পাঠক খবরের শুরুতেই বলেনঃ 'আপনাদের সঙ্গে আছি আমি...অমুক'। তাদের সঙ্গে থাকার অর্থ হচ্ছে ঃ তাদের কথা শোনার মাধ্যমে অথবা তাদেরকে টেলিভিশনে দেখা ও শোনার

মাধ্যমে আমরা তাদের সঙ্গে। কিন্তু আমরা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারি না বা তারা আমাদের সঙ্গে স্বশরীরেও উপস্থিত নন। অনুরুপভাবে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সঙ্গে থাকেন তার অর্থ হলোঃ তিনি তাঁর মহান জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে মানুষের অতি নিকটে থাকেন এমনকি তাদের অন্তরের কল্পনাও তিনি জানেন। যেমন তিনি বলেনঃ

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)

অর্থঃ "আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তর তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ের শাহ্ রগ অপেক্ষাও (জ্ঞানের মাধ্যমে) নিকটতর"। (সুরা ক্বা'ফঃ ১৬ নং আয়াত) আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সঙ্গেও আছেন যেমন তিনি বলেন ঃ

(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) **سورة النحل : ١٢٨**

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরই সঙ্গে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে (অর্থাৎ-যারা অবৈধ ও হারাম কর্ম পরিত্যাগ করেছে) এবং যারা সৎকর্ম পরায়ন"। (সুরা নাহল ঃ ১২৮ নং আয়াত)

মহান আল্লাহর সঙ্গে থাকার অর্থ হলঃ তিনি তাঁর সাহায্য, সহযোগিতা, অনুগ্রহ, দয়া, ক্ষমতা, ইল্‌ম তথা জ্ঞান, শ্রবনশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে আছেন। কিন্তু তাঁর সত্তা সৃষ্টিকূল থেকে অনেক উর্ধ্বে, তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও সাহায্যের মাধ্যমে বান্দার সঙ্গে থাকেন এর অনেক প্রমাণ আছে। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী মুসা ও হারুন (আলাইহিমাস্‌সালাম) কে অভয় দিয়ে বলেছিলেন ঃ

(قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى) (٤٦) سورة طه

অর্থ ঃ "তিনি (আল্লাহ্) বললেন ঃ তোমরা (উভয়ে) ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনবো ও দেখবো"। (সুরা ত্বা-হা ঃ ৪৬ নং আয়াত)

উক্ত আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও সাহায্যের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে থাকেন কিন্তু তাঁর পবিত্র যাত বা সত্তা সৃষ্টি জগত থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা এবং তিনি অনেক উর্ধ্বে। অর্থাৎ-তাঁর পবিত্র যাত বা সত্তা আরশের উর্ধ্বে সমুন্নীত কিন্তু তিনি তাঁর জ্ঞান, শক্তি, দয়া ও সাহায্যের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আর এভাবেই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের অতি নিকটে থাকেন।

ইসলামের দ্বিতীয় মূলনীতি

দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখা

ইসলামের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো ঃ দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। এ ব্যাপারে আমি শুরুতেই মোটামুটি ভাবে আলোচনা করেছি। তার পরেও এখানে আমি সংক্ষেপে তা পেশ করছি ঃ

ইসলাম বলা হয় ঃ তাওহীদ বা একত্ববাদের সাথে এক ও একক, অদ্বিতীয় আল্লাহর উদ্দেশ্যেই আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা, শিরক এবং মুশরিকদের থেকে মুক্ত থাকা।

যে ব্যক্তি ইহা স্বীকার করতঃ তা পালন করে তাকেই মুসলিম বলে। ('তিনটি মৌলনীতি'এবং 'মনোনীত ধর্ম' ১৮ পৃঃ)।

ইসলামের রোকন কয়টি ও কি কি ? তার প্রমাণ

ইসলামের রোকন বা স্তম্ভ হলো পাঁচটি যথা ঃ

(১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দেয়া যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল। এর দলীল মহান আল্লাহর বাণী ঃ

(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ)

অর্থঃ "সুতরাং তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন মা'বুদ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্যে। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন"। (সুরা মুহাম্মাদ ঃ ১৯) ইহাই হলো পবিত্র কালিমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর দলীল। এই কালিমাটিতে আল্লাহর সাক্ষ্য দেয়ার সাথে সাথে আরও একটি সাক্ষ্য দেয়া জরুরী আর সেটি হলো ঃ মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল। তিনি যে রাসূল তার প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী ঃ

(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ) آل عمران ١٤٤

অর্থঃ "আর মুহাম্মাদ (ﷺ) রাসূল ব্যতীত কিছুই নন, নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বের রাসূলগণ বিগত হয়েছেন, অনন্তর যদি তাঁর মৃত্যু হয় অথবা তিনি নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেউ পশ্চাদপদে ফিরে যায়, তাতে সে আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরষ্কার প্রদান করেন"। (সুরা আল-ইমরানঃ ১৪৪ নং আয়াত)

তাই এই রাসূলের প্রতি ঈমান নিয়ে আসা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এর সমর্থনে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٢٨) الحديد

অর্থঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর (ঈমান নিয়ে আস), তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরষ্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদেরকে এমন আলো দিবেন যার সাহায্যে তোমরা চলবে আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। (সুরা হাদীদঃ ২৮ নং আয়াত)

(২) সালাত (নামায) কায়েম করা ঃ এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ

(وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) سورة هود (١١٤)

অর্থঃ "আর নামায কায়েম কর দিনের দু'প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে, নিঃসন্দেহে নেকী সমূহ গুনাহ সমূহকে মিটিয়ে দেয়, ইহা একটি নসীহত, (আল্লাহকে) স্মরণকারীদের জন্য"। (সুরা হূদ ঃ ১১৪ নং আয়াত)

(৩) যাকাত প্রদান করা। এর দলীল যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

(وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ) سورة البينة : ٥

অর্থঃ "তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে খাঁটিভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে, এটাই সরল সঠিক দ্বীন-ধর্ম"। (সুরা বাইয়্যিনাহ ঃ ৫ নং আয়াত)

(৪) রামাযান মাসের সিয়াম পালন করা। এর দলীল আল্লাহর বাণী ঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

অর্থঃ "'হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর রোযাকে ফরয করা হয়েছে। যেরুপ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার'। (সুরা বাকারা ঃ ১৮৩ নং আয়াত)

(৫) সামর্থ হলে আল্লাহর ঘর কা'বা গৃহের হজ্জ ব্রত পালন করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} سورة آل عمران : ٩٧

অর্থঃ "মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছবার সার্মথ্য আছে, সে যেন (আল্লাহর জন্য) হজ্জ আদায় করে। আর কেউ যদি অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে অমুখাপেক্ষী"। [আল-ইমরান ঃ ৯৭]

ইসলামের এ পাঁচটি স্তম্ভের ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بُنِيَ الْاِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلَ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) صحيح البخاري

অর্থঃ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন রাসুলূল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন ঃ "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। (১) এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন (সত্য) মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। (২) নামায কায়েম করা। (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) (বাইতুল্লাহর) হজ্জ করা। (৫) রামাযানের রোযা রাখা।

(সহীহ বুখারী ৮ নং হাদীস)

ইসলামের তৃতীয় মূলনীতি

রাসূল ﷺ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা

ইসলামের তৃতীয় মূলনীতিটি হল ঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। আমাদের নবীর নাম মুহাম্মাদ (ﷺ)বিশুদ্ধ মতানুসারে তিনি ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে ২০ অথবা ২২শে এপ্রিল মোতাবেক আরবী ৯ই রবিউল আউয়াল মাসে পবিত্র মক্কা নগরীতে সোমবার সকাল বেলায় সময় জন্ম গ্রহণ করেন। (দেখুনঃ বাংলা আর রাহীকুল মাখতুম গ্রন্থের ১০১ পৃঃ প্রকাশ-১৯৯৫)

নবী ﷺ এর বাবার নাম আব্দুল্লাহ এবং মায়ের নাম আমেনা। তাঁর দাদার নাম আব্দুল মুত্তালেব বিন হাশেম এবং হাশেম কুরাইশ বংশের আর এই কুরাইশরাই আরব বংশোদ্ভূত হযরত ঈসমাইল বিন ইব্রাহীম (আলাইহিমাস্ সালাম) এর বংশধর। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ৬৩ বৎসর বেঁচেছিলেন। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়্যত লাভ করেন এবং পরবর্তী ১৩ বছর মক্কায় এবং ১০ বছর মদীনায় এই মোট তেইশ বছর তিনি নবী ও রাসূল হিসেবে অহী প্রাপ্ত হয়ে নবুয়্যতী জিন্দেগী যাপন করেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

(يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦)) سورة المدثر

অর্থঃ “হে বস্ত্রাচ্ছাদিত (রাসূল ﷺ), উঠ-সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, তোমার পোষাক পবিত্র রাখো, অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো এবং অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করো না”। (সুরা মুদ্দাসসিরঃ ১-৬ নং আয়াত)

তিনি মক্কায় তের বৎসর লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন এবং পরবর্তীতে মদীনায় হিজরত করে তথায় দশ বছর লোকদেরকে তাওহীদ সহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে যেমনঃ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, আযান, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি আহব্বান করতে থাকেন। তিনি ১১ জন নারীকে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি ৯ জন স্ত্রী রেখে গেছেন। তিনি ৬৩ (তেষট্টি) বৎসর ৪ মাস বয়সে ইহজগত ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। অনেকেই বলেন রাসূল (ﷺ) মৃত্যুবরণ করেননি অথচ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) سورة الزمر: ٣٠

অর্থঃ “(হে মুহাম্মাদ ﷺ) আপনি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল”। (সুরা যুমার ঃ ৩০ নং আয়াত) তিনি আমাদের মতই রক্তে মাংসে গড়া মাটির মানুষ ছিলেন। তাঁকে নূরের তৈরী বলা বৈধ নয়, তবে তাঁর মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান ছিল অত্যন্ত বেশী। যেমন কোন প্রধান মন্ত্রী ও একজন সাধারণ মানুষের মর্যাদা এক নয়, যদিওবা উভয়েই মানুষ থেকে আলাদা নয়, তদ্রুপ মুহাম্মাদ (ﷺ)ও সৃষ্টিগত দিক থেকে আমাদের মতই মানুষ কিন্তু তাঁর মর্যাদা অপরিসীম যা বর্ণনা করে শেষ করার মতো নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ) سورة الكهف ١١٠

অর্থঃ “(হে মুহাম্মাদ ﷺ) আপনি বলে দিনঃ আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, (তবে পার্থক্য হলো) আমার নিকট অহী আসে, মূলত তোমাদের মা'বুদই একমাত্র মা'বুদ”। (সুরা কাহফ-১১০ নং আয়াত) তিনি এক মহান

আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহব্বান করার জন্য এবং শিরক থেকে দূরে রাখার জন্য মানব ও দানব সকলের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেনঃ

(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) سورة الأعراف : ١٥٨

অর্থঃ (হে মুহাম্মাদ ﷺ) আপনি ঘোষণা করে দিনঃ 'হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি"। (সুরা আ'রাফ-১৫৮ নং আয়াত)

নবী (ﷺ) সদা সত্য কথা বলতেন, গরীব দুঃখী ও ইয়াতীমদের সাহায্য করতেন ও তাদেরকে আহার দিতেন, পীড়িতদের সেবা করতেন, পথহারা লোকদের সুপথের দিশা দিতেন, মু'মেনদের প্রতি ছিলেন বিনয়ী, এক কথায় তাঁর চরিত্র ছিল অত্যন্ত অমায়িক। যার কথা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা এভাবে ঘোষণা করেছেনঃ (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) سورة القلم : ٤

অর্থ ঃ "আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী"।

(সূরা কলম ঃ ৪ নং আয়াত)

তাই, আমাদের উচিত নবী (ﷺ) এর প্রতি ঈমান নিয়ে আসা, তাঁকে সম্মান করা, তাঁকে সাহায্য করা, তাঁর আদেশ ও নিষেধ গুলি যথাযথ ভাবে মেনে চলা, তাঁর আনিত বিধানাবলীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং তিনি যে সব বিষয়ে সতর্ক করেছেন সেগুলি থেকে দূরে থাকা এবং সর্বদা তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা। কেননা তাঁর মাধ্যমেই দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেনঃ

(اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً)

অর্থঃ "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন (ইসলামকে) পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম"। (সুরা মায়িদাহ ঃ ৩ নং আয়াত)

সার কথা হলোঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তিনি বহু গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ ছিলেন। তাঁর অতুলনীয় নেতৃত্ব, আদর্শ, প্রজ্ঞা, মহানুভবতা, উদারতাসহ নানাবিদ চরিত্রের কারণেই অনেক রুক্ষ্য প্রকৃতির স্বজাতীয় লোকেরা একেবারে নমনীয় হয়ে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ধন্য হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে নবী করীম (ﷺ) এর গুণাবলী লিখে শেষ করা সম্ভব নয়, কেননা পবিত্র কুরআন মাজীদই ছিল তাঁর উত্তম আদর্শের বাস্তব নমুনা। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর এবং তাঁর পরিবার পরিজনের উপর এবং সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর অফুরন্ত শান্তিধারা ও বরকত নাযিল কর, আমীন!।

উপসংহারঃ আমরা জানি মানুষ কবরস্থ হলে আল্লাহ তা'য়ালা তার কাছে দু'জন ফিরেশ্তা পাঠিয়ে তিনটি প্রশ্ন করবেন আর তা হলো এইঃ

১ নং প্রশ্নঃ তোমার প্রভূ কে? উত্তর হবে- আমার প্রভূ আল্লাহ।

২ নং প্রশ্নঃ তোমার দ্বীন কি? উত্তর হবে-আমার দ্বীন ইসলাম।

৩ নং প্রশ্নঃ তোমার নবী কে? উত্তর হবে- আমার নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)।

এ জন্যই আমরা উক্ত তিনটি মূল বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম।

দ্বীনের স্তর হলো তিনটি যথা ঃ

(১) ইসলাম, (২) ঈমান ও (৩) ইহ্সান।

দ্বীনের প্রথম স্তর ইসলাম ঃ এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

দ্বীনের দ্বিতীয় স্তর ঈমানঃ ঈমানের সংজ্ঞা

ঈমান অর্থ হলো ঃ আনুগত্য ও গ্রহণের জন্য দৃঢ় বিশ্বাস করা, যার বাস্তবায়ন মুখে স্বীকৃতি, অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস এবং বাহ্যিক কাজের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ তিনটি বস্তুর সমন্বয়কেই ঈমান বলা হয়। এই ঈমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং পাপ ও গুনাহের কারণে তা কমে যায়। ঈমানের অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অর্থঃ আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ﷺ) এরশাদ করেছেন ঃ "ঈমানের শাখা হচ্ছে সত্তুরের কিছু বেশী অথবা ষাটের কিছু বেশী। তার মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠটি হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের আর কোন মা'বুদ নাই" এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করা। এবং সর্ব নিম্নটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারণ করা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা"। (সহীহ বুখারী ঃ ৯ নং এবং মুসলিম ঃ ৩৫ নং হাদীস) তাই, আহলে সুন্নাত অল-জামাআতের নিকটে সর্ব প্রকার ভাল কাজকেই ঈমানের অংশ বলা হয়ে থাকে।

ঈমানের রোকন বা স্তম্ভ সমূহ

ঈমানের রোকন বা স্তম্ভ হলো ছয়টি ঃ যথা ঃ

১ / *আল্লাহর উপর ঈমান হলো,* আল্লাহর উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় অবগত হওয়া খুবই জরুরী।

প্রথমতঃ মহান আল্লাহর **অস্তিত্বকে** স্বীকার করা অপরিহার্য কর্তব্য। যা নিজের স্বভাবজাতের মাধ্যমে, জ্ঞান-বুদ্ধি, শরীয়তের অহী ও অনুভূতির মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করা যায় ও তা অনুধাবন করতে হয়। আর সাথে সাথে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে এবং তিন প্রকার তাওহীদে পরিপক্ক ঈমান আনতে হবে। তিন প্রকার তাওহীদ হলোঃ (১) তাহীদে রুবুবিয়্যাহে। (২) তাওহীদে উলুহিয়্যাতে । (৩) তাওহীদে আসমাই অস সিফাতে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ- প্রভূত্বের ক্ষেত্রে তাঁকেই সকল কিছুর সৃষ্টিকারী ও নিয়ন্ত্রক মেনে নেয়া। আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি আরশে আযীমের উর্ধ্বে সমুন্নত রয়েছেন, তিনি মহাশক্তিধর, অদৃশ্যমান আলিমুল গায়িব, তিনি সব কিছু জানেন ও দেখেন এবং তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই। তিনিই সকল কিছুর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক এই বিষয় গুলি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

(يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) [فاطر : ١٣]

অর্থঃ “তিনি (আল্লাহ) রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (কাজে নিয়োজিত করে) নিয়ন্ত্রিত করছেন। প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্; তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, তারা তো খেজুরের আঁটির তুচ্ছ আবরণেরও অধিকারী নয়”। (সূরা ফাতিরঃ ১৩ নং আয়াত) আর এটিকেই তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ বলা হয়।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর উলুহিয়্যাতে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ- ইবাদতের ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। যা তাঁকে সম্মান করে ও ভালবেসে করতে হবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করা যাবে না কেননা তিনিই সত্য মাবূদ। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

(ذلِكَ بِـــأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِــيرُ) [سورة الحج : ٦٢]

অর্থঃ “এটা এ কারণেও যে, আল্লাহ্ তিনিই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা তো অসত্য এবং আল্লাহ্ই সমুচ্চ মহান”। (সূরা হাজ্জঃ ৬২ নং আয়াত) আর এটিকেই তাওহীদে উলুহিয়্যাহ বলা হয়।

চতুর্থতঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ- পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীস সমূহে আল্লাহর যে সব নাম ও গুণাবলী যেভাবেই বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই সে গুলিকে মেনে নেয়া। এ ব্যাপারে কোন রকম শিথিলতা না করা এবং তাতে কোন প্রকার সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, উদাহরণ, উপমা, তুলনা, সাদৃশ্য করণ অথবা নাকচ করণ কোন প্রকার কাজই করা থেকে বিরত থাকা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) [سورة الشورى : ١١]

অর্থঃ " কোন কিছুই তাঁর সদৃশ্য নয় , তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা শূরা আয়াত নং ১১) এ ব্যাপারে আরও দেখুনঃ (সুরা আ'রাফঃ ১৮০ নং এবং সূরা আল রুম ২৭ নং আয়াত) আর এটিকেই তাওহীদে আসমাই অসসিফাত বলা হয়।

অতএব, মহান আল্লাহর **অস্তিত্বকে** স্বীকার করে তাঁর প্রভূত্বে বা রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাস করার সাথে সাথে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে বিশ্বাস করে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস করার মাধ্যমেই প্রকৃত **তাওহীদের** বাস্তবায়ন সম্ভব। তাই, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে নিয়ে তাঁর হুকুম আহ্কাম মেনে চলাই হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনার শামিল। আর এভাবেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখাই হলো আল্লাহর উপর ঈমান। (সুরা বাকারাহ ঃ আয়াত নং ১৭৭)

২ / ফেরেশ্তাগণের উপর ঈমান, অর্থাৎ ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর এমন এক অদৃশ্যমান সৃষ্টিজীব যাদেরকে আল্লাহ নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, যারা সর্বদায় আল্লাহর নিকট সম্মানিত বান্দাহ হিসেবে পরিগণিত হন, তাঁরা সর্বদাই আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলেন। তারা কখনও তাঁর কোন বিরুদ্ধাচারণ করেন না। আল্লাহ তাদেরকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন তার পরেও তারা কোন অহংকার করেন না। তারা দিন রাত আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতেই মশগুল থাকেন। তাঁদের সংখ্যা অগণিত তাদের মধ্যে প্রধান ফেরেশ্তা হলেনঃ জিব্রাঈল (عليه السلام) যিনি অহীর বার্তা নিয়ে নবী-রাসূলগণের নিকট উপস্থিত হতেন। আর অন্যান্য ফেরেশ্তাগণ হলেন মিকাঈল (عليه السلام) যিনি মেঘমালা ও বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন। ইস্রাফিল (عليه السلام) যিনি কিয়ামতের পূর্বে সিঙ্গায় দু'টি ফুৎকার দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন। মালাকুল মউত বা আজরাঈল (عليه السلام) যিনি প্রাণী কূলের জীবন হরণ করে মৃত্যু প্রদানের কাজে নিয়োজিত আছেন। তাঁরা ছাড়াও

আল্লাহর উল্লেখযোগ্য ফেরেশ্তাগণ হলেনঃ নেকী-বদী লেখার কাজে নিয়োজিত সম্মানিত ফেরেশ্তা যাঁদেরকে কিরামান কাতেবীন বলা হয়। কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশ্তা, জাহান্নামের প্রধান ফেরেশ্তা মালেক, আরশ বহনকারী ৮ জন ফেরেশ্তা এবং জান্নাতের প্রধান ফেরেশ্তা রেযওয়ান ছাড়াও আরও কত যে ফেরেশ্তা রয়েছেন তার খবর একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। তাঁদের একেক জনকে আল্লাহ একেক রকম দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই, মহান আল্লাহর সকল ফেরেশ্তাগণকেই বিশ্বাস করা বা তাঁদের উপর ঈমান নিয়ে আসা এবং তাঁদের অস্তিত্বকে স্বীকার করা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। (সুরা বাকারাহ ঃ ১৭৭ ও ২৮৫ নং, সুরা তাহরীম ঃ ৬ নং, সুরা হাক্কাহ ঃ ১৭ নং আয়াত)

৩। আসমানী কিতাব সমূহের উপর ঈমান, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সমস্ত কিতাব যুগে যুগে মানব জাতির হেদায়েতের জন্য নবী রাসূলগণের নিকট অবতীর্ণ করা হয়েছে সেগুলিকেই আসমানী কিতাব বলা হয়। যেমনঃ তাওরাত কিতাবঃ মুসা (عليه السلام) এর উপর, জাবুর কিতাবঃ দাউদ (عليه السلام) এর উপর, ইঞ্জিল কিতাবঃ ঈসা (عليه السلام) এর উপর এবং সর্ব শেষ কিতাব পবিত্র কুরআন মাজীদ আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। অনুরুপভাবে নবী ইব্রাহীম (عليه السلام) ও নবী মুসা (عليه السلام) এর উপর অবতীর্ণ সহীফারও বর্ণনা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। এগুলি ছাড়াও আরও অনেক আসমানী কিতাব মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন যার সঠিক সংখ্যা তিনি ব্যতীত আর কেউ জানেন না। উক্ত সকল আসমানী কিতাব সমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে তা বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু আমল করতে হবে পবিত্র কুরআন মাজীদ অনুযায়ী। যেহেতু এটি সর্ব শেষ আসমানী কিতাব এবং এটি অপরিবর্তনীয়। কিন্তু অন্যান্য আসমানী কিতাব গুলিতে পরিবর্তন করা হয়েছে, এমনকি পরিবর্তন করা না হলেও তা মানা যেত না, কেননা সেটি আমাদের জন্য শরীয়ত নয়। যেহেতু শরীয়তে মুহাম্মাদী পূর্বের সকল শরীয়তকে রহিত

করে দিয়েছে তাই, সেগুলি মানা যাবে না তবে সেগুলি বিশ্বাস করতে হবে মাত্র। (সুরা বাকারাহ ঃ ৪ নং, সুরা আ'লা ঃ ১৮ ও ১৯ নং আয়াত)

৪। নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান, অর্থাৎঃ নবী-রাসূলগণ সকলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর একত্ববাদের বা তাওহীদের দাওয়াত দিতেন, জাহান্নামের ভয় দেখাতেন এবং জান্নাতের সু-সংবাদ দিতেন। তাঁদের মধ্যে 'উলূল আযম' তথা দৃঢ় প্রতিজ্ঞবান রাসূল হলেন পাঁচজন যথা ঃ নূহ (عليه السلام), ইব্রাহীম (عليه السلام), মুসা (عليه السلام), ঈসা (عليه السلام) ও শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। (সুরা বাকারাহ ঃ ১৭৭ ও সুরা আহক্বাফ ঃ ৩৫ নং আয়াত)

৫। আখেরাত বা শেষ দিবসের উপর ঈমান, অর্থাৎ-সকলের মৃত্যুর পর আবার আমাদেরকে পূণর্জ্জীবিত করা হবে। সেদিন পার্থিব সকল কর্মের হিসাব হবে, ফলে কেউ হবে জাহান্নামবাসী আবার কেউ হবে জান্নাতি। এ দিনের উপর বিশ্বাস রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য। উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখার দলীল মহান আল্লাহর বাণী ঃ

(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) سورة البقرة : ١٧٧

অর্থঃ "তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তীত করাতে কোন পূণ্য নেই। বরং পূণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশ্‌তাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে"। (সূরা বাকারাহ ঃ ১৭৭ নং আয়াত)

৬। ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান, অর্থাৎ-এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকুলের সার্বিক দিকের পূর্বের জ্ঞান অনুযায়ী মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জীবনে ভাল এবং মন্দ যাই সংঘটিত করেন তা সবই তাঁর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কেননা

আল্লাহর ইচ্ছার উপর আর কারো ইচ্ছার কোন মুল্য নেই, তাই তিনি যা ইচ্ছা করেন শুধূ তাই সংঘটিত হয়ে থাকে এ কথা খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখাই হলো তাক্বদীরের প্রতি ঈমান নিয়ে আসা। এর দলীল মহান আল্লাহর বাণী ঃ

(إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) سورة القمر (٤٩)

অর্থ ঃ "আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে"।

(সূরা কামারঃ ৪৯ নং আয়াত)

ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান নিয়ে আসার ক্ষেত্রে চার ধরণের বিশ্বাস রাখা খুবই জরুরী যেমন ঃ

১। এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেকটি জিনিসের সমষ্টিগত দিক এবং ব্যখ্যামূলক সকল দিকগুলি খুব ভালভাবেই অবগত আছেন এবং তা জানেন।

২। এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'য়ালা ভাগ্য সম্পর্কিত এ বিষয় গুলি লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। (দেখুনঃ সুরা হজ্জঃ ৭০ নং আয়াত)

৩। এই বিশ্বাস রাখা যে, সারা বিশ্বে যা কিছুই সংঘটিত হয় তা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে। (দেখুনঃ সুরা তাকভীরঃ ২৯ নং আয়াত)

৪। এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহই সকল কিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি ব্যতীত যা কিছু আছে এসবই তাঁর সৃষ্টিজগত। (দেখুনঃ সূরা রা'আদঃ ১৬ নং আয়াত)

দ্বীনের তৃতীয় স্তর : ইহসান

ইহসান বলা হয়ঃ সুসম্পাদন করাকে। অর্থাৎ-এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন আপনি আল্লাহকে দেখছেন, আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে জেনে

রাখুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। এক কথায় আল্লাহকে ভয় করে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার নামই হলো ইহসান, আর এটিই হলো ইহসানের রোকন বা স্তম্ভ। এই ইহসানকারীদের সাথে মহান আল্লাহ থাকেন। (অর্থাৎ- তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন) যেমন তিনি বলেনঃ

(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) سورة النحل : ١٢٨

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ"। (অর্থাৎ-ইহসানকারী) (সূরা নাহল ঃ ১২৮ নং আয়াত ও বুখারী ৫০ নং হাদীস)

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস

ইসলামকে উপলব্ধি করার প্রধান বা মূল উৎস হলো দু'টিঃ একটি হলো, পবিত্র কুরআন মাজীদ আর অপরটি হলো রাসূল (ﷺ) এর বাণী বা হাদীস সমূহ।

(ক) প্রধান উৎস হলোঃ মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীমঃ যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) سورة النساء : ١٠٥

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি তদনুযায়ী মানবদের মাঝে বিচার ফয়সালা করতে পার, যা আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দান করেছেন এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না"। (সূরা নিসা ঃ ১০৫ নং আয়াত)

(খ) দ্বিতীয় উৎস হলো ঃ নবী করীম (ﷺ) এর মুখ নিঃসৃত বিশুদ্ধ হাদীস সমূহঃ এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী হচ্ছে ঃ

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) سورة الحشر : ٧

অর্থঃ "আর রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর"। (সূরা হাশরঃ ৭ নং আয়াত)

এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেছেনঃ "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে দু'টিকে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ তোমরা পদচ্যুত হবে না। আর সে দু'টি হলোঃ (১) আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন মাজীদ ও (২) আমার সুন্নাত হাদীস সমূহ"। (বর্ণনায় ইমাম আহমাদ ও মুয়াত্তা ইমাম মালেক ঃ ৩৩৩৮ নং হাদীস)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা শরীয়তের কোন বিষয়ে পরস্পর মতোবিরোধ দেখা দিলে তার সমাধানের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর দিকেই ধাবিত হতে বলেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী হলো ঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) سورة النساء : ٥٩

অর্থঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের অন্তর্গত আদেশ দাতাগণের। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয়, তবে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক, এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি"। (সূরা নিসা ঃ ৫৯ নং আয়াত)

উপরোক্ত উৎস দু'টি ছাড়াও পরবর্তী ফিকাহ্‌বিদগণ আরও দু'টি বিষয়কে ইসলামী শরীয়তের উৎস হিসেবে পরিগণিত করেন আর তা হলো এইঃ

(গ) ইজমায়ে উম্মাত তথা সর্বসম্মতি থেকে প্রাপ্ত গঠন মূলক কোন শরীয়তি সিদ্ধান্ত। তবে এই ইজমায়ে উম্মাত অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের স্বপক্ষেই হতে হবে। আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) এর কোন আদেশ বা নিষেধের সাথে যেন তা সাংঘর্ষিক বা বিপরীত না হয়।

(ঘ) এবং পরিশেষে কিয়াস বা যুক্তিসঙ্গত মতামত। কিয়াস দু'প্রকার হয়ে থাকেঃ

(১) সহীহ কিয়াসঃ যা কুরআন ও হাদীসের অনুকূলে বা পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে থাকে।

(২) বাতিল কিয়াসঃ যা কুরআন ও হাদীসের প্রতিকূলে বা বিপক্ষে কোন গৃহিত সিদ্ধান্ত। সুতরাং, বাতিল কিয়াস দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা তা মানা অবৈধ এবং নিষিদ্ধ। **এই হলো ইসলামী শরীয়তের উৎসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।**

ইসলাম বিনষ্টকারী বস্তু বলতে কি বুঝায় ?

হে মুসলিম ভাই ও বোন!

আপনি জেনে রাখুন যে, আল্লাহ সুবহানাহু অতা'য়ালা তাঁর সকল বান্দাহর প্রতি দ্বীন ইসলাম গ্রহন করা ফরয করেছেন। সাথে সাথে তার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ইসলাম যা নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকাও

আমাদের উপর একান্ত কর্তব্য হিসেবে অর্পণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা এই ইসলামের বাহক হিসেবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) কে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে তারা মুক্তি পাবে। আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা ধ্বংস হবে।

তাই তো নবী (ﷺ) শিরক, কুফর, নিফাক এবং দ্বীন ত্যাগ করা হতে সতর্ক করেছেন। আর ইসলাম বিনষ্টকারী বস্তু বলতে এই দ্বীন ইসলামকে ত্যাগ করা এবং তার সীমানা থেকে বেরিয়ে যাওয়াকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সেগুলিকে কেন্দ্র করেই শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব, শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বায (রাহিমাহুমুল্লাহ্) সহ বিজ্ঞ আলেম উলামাগণ বিশেষ বিশেষ মূল দশটি ধ্বংসাত্মক কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। কোন মুসলিম বান্দাহ্ তাতে নিপতীত হলে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে এবং তার ইসলাম বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই উক্ত ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় গুলি সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে আলোচনা করা হলো যাতে করে আমরা সেগুলি থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

ইসলাম বিনষ্টকারী মূল বিষয় সমূহ

ইসলাম বিনষ্টকারী ধ্বংসাত্মক মূল বিষয় দশটি যথাঃ

(১) শিরক করা ঃ আল্লাহর সত্তা, তাঁর নাম ও গুণাবলী এবং তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করাই হলো শিরক। যেমনঃ পীর, দরবেশ, মৃত্যু ব্যক্তি এবং কবরবাসীদেরকে ডাকা, তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, তাদের উদ্দেশ্যে নযর, মানত, দান–খয়রাত ও কুরবানী করা,

আল্লাহ্ ছাড়া জিন্, ভূত, দেবতা ইত্যাদিকে ভয় করে তাদের উদ্দেশ্যে যবেহ করা। এ গুলি হলো বড় শিরকের অর্ন্তভূক্ত। যারা এ গুলিতে লিপ্ত হয়ে তওবা না করেই মৃত্যু বরণ করবে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا) سورة النساء :٤٨

অর্থঃ "আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর যে কেউ আল্লাহর অংশী স্থির করবে সে মহাপাপে জড়িয়ে মিথ্যা রচনা করবে"। (সূরা নিসাঃ ৪৮ নং আয়াত)

মহান আল্লাহর আরও ঘোষণা হলো যেঃ তিনি মুশরিকের জন্য জান্নাত চিরতরে হারাম করেছেন এবং সে সদা-সর্বদাই জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ -

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ سورة المائدة : ٧٢

অর্থঃ "যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম (নিষিদ্ধ) করবেন ও তার আবাস হবে জাহান্নাম; আর সীমালংঘন কারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই"। (সূরা মায়িদাহঃ ৭২ নং আয়াত)

অতঃএব, আমাদের উচিত এই শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরবর্তীতে পেশ করব ইন্শা আল্লাহ্।

(২) আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে অসীলা নির্ধারণ করাঃ অর্থাৎ- যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে পীর, মুর্শিদ এবং অলী আউলিয়াদেরকে অসীলা বা মাধ্যম ধরে এবং তাদের মাধ্যমে সুপারিশ কামনা করে এবং তাদের উপর ভরসা করে। সকলের ঐক্যমতে তারা ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ-তারা মহান আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে তাদের অলী আউলিয়াদের নৈকট্য লাভের

আশায় তাদের নিকট প্রার্থনা করে, সাহায্য চায় এবং তাদের মর্যাদা ও সম্মানার্থে কুরবানী ও মানত করে। অথচ এই গুলিই হলো শিরক, কিন্তু তারা এই শিরকের নাম দিয়ে থাকে যে, আমরা নেক্‌কারদের অসীলা হিসাবে গ্রহণ করি এবং তাদেরকে আমরা মহব্বত করি।

তারা আরও বলে যে, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না। অথচ এ ধরনের কথাই পূর্বেকার মুশরিকরা বলেছিল, তারা সে কথা ভুলে গিয়েছে। যেমন তাদের পূর্বেকার মুশরিকরা বলেছিল ঃ

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (سورة الزمر: ٣)

অর্থঃ "আমরা তো তাদের (মূর্তি গুলির) ইবাদত এই জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে"। (সূরা জুমারঃ ৩ নং আয়াত)

(৩) কাফেরদেরকে কাফের মনে না করাঃ অর্থাৎ-যারা কাফেরদেরকে কাফের হিসেবে মনে করে না এবং তারা যে মুশরিক তাতে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের ধর্মকেই সঠিক ধর্ম বলে বিশ্বাস করে। তারাও ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায়।

(৪) যে ব্যক্তি মনে করে যে, রাসূল (ﷺ) কর্তৃক আনিত হেদায়েতের চেয়ে অন্যের হেদায়েতই শ্রেষ্ঠঃ অর্থাৎ-যারা আল্লাহর ও রাসূল (ﷺ) এর পথ নির্দেশের চেয়ে তাদের নেতা-নেত্রী, পীর-দরবেশ, ঠাকুর-পুরহীত, আলেম-উলামা, ইমাম ও মাযহাবের বিধানকেই উত্তম মনে করে। অনুরুপ ভাবে যারা মানব রচিত আইন ও কানুনকেই নিজেদের চলার পথ হিসেবে আঁকড়ে ধরে এবং এই বিশ্বাস করে যে, বর্তমান এই একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামী শরীয়তের আইন অচল। যেমনঃ চোরের হাত কর্তন করা, বিবাহিত নারী পুরুষ যেনা করলে তাদেরকে রযম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা, কেউ কাউকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে তাকে হত্যা করা ইত্যাদি বিষয় গুলিতে আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)

এর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না এবং সে ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও কানুনকেই উত্তম মনে করে। তারাও ইসলামের সীমানা থেকে বেরিয়ে যায়। যেমন আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) سورة المائدة : ٤٤

অর্থঃ "আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিচার ফয়সালা করে না তারাই কাফের। (সূরা মায়িদাহঃ ৪৪ নং আয়াত)

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করাকে বড় কুফরীতে লিপ্ত হওয়া বুঝায়। যার ফলে সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হয়।

(৫) রাসূল (ﷺ) যে সব বিধানাবলী নিয়ে এসেছেন সে গুলিকে ঘৃণা ও অপছন্দ করা, যদিও সে তা অনুযায়ী আমল করেঃ অর্থাৎ-কেউ যদি অসন্তুষ্ট হয়ে, অপছন্দের সাথে ঘৃণাভরে কোন ইসলামী শরীয়তের কাজও করে তবুও সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হবে। যেমন আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٩)) سورة محمد

অর্থঃ "এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন"। (সূরা মুহাম্মাদঃ ৯ নং আয়াত)

(৬) রাসূল (ﷺ) যে সব বিষয়কে দ্বীনের মধ্যে শামিল করেছেন সে গুলিকে নিয়ে এবং সওয়াব ও শাস্তিকে নিয়ে ঠাট্রা-বিদ্রুপ করাঃ যেমনঃ কেউ যদি দাড়ি রাখা, পুরুষদের জন্য পায়ের গিরার উপর কাপড় পরিধান করা, মিসওয়াক তথা দাঁতন করা, মহিলাদের বোরখা পরিধান করা নিয়ে ঠাট্রা বিদ্রুপ করে, তবে সেও ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হবে। যেমন আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) (٦٦) التوبة

অর্থঃ "আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা অবশ্যই বলবেঃ আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাসা করছিলাম। তুমি বলে দাওঃ তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা এখন (অহেতুক) ওযর দেখার চেষ্টা করিও না; তোমরা তো বিশ্বাস স্থাপনের পর কুফরী করেছো"। (সূরা তাওবা ঃ ৬৫-৬৬ নং আয়াত) তাই, কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসুল (ﷺ), ইসলাম ও মুসলিমকে নিয়ে ঠাট্রা বিদ্রুপে লিপ্ত হলেই সে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

(৭) যাদু করা ঃ যাদু এমন কিছু গোপন কাজ ও মন্ত্রের নাম, যা দ্বারা অন্যের ক্ষতি হয়ে থাকে। এ কাজ করতে গেলে যাদুকরকে কুফরী করতে হয়। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

(وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) سورة البقرة : ١٠٢

অর্থঃ "আর কিন্তু শয়তানরাই কুফুরী করেছিল, তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত"। (সূরা বাকারা -১০২ নং আয়াত) এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ "তোমরা ঈমান ধ্বংসকারী সাতটি বিষয় থেকে বেঁচে থাক, তার মধ্যে একটি হলঃ যাদু করা"। (বুখারী হাদীস নং ২৭৬৬)

যারা যাদু শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয় ও তাতে সন্তুষ্ট থাকে তারাও ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

(وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ) البقرة:١٠٢

অর্থঃ "এবং তারা (দুই ফিরেশ্‌তা হারুত ও মারুত) উভয়ে কাউকেও ওটা (যাদু) শিক্ষা দিত না, এমনকি তারা বলত যে, আমরা পরীক্ষা স্বরুপ ছাড়া কিছুই নই। অতএব, তুমি কুফুরী করো না"। (সূরা বাকারাহ ঃ ১০২ নং আয়াত)

অতএব, বুঝা গেল যে, যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা হলো কুফুরী।

(৮) কাফের ও মুশরেকদের পক্ষাবলম্বন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করাঃ অর্থাৎ-যারা মুসলমানদের ঘৃণা করে অমুসলিমদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে, ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে, তারাও ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) سورة المائدة : ٥١

অর্থঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তো পরস্পর বন্ধু, আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী জাতিকে সুপথ প্রদর্শন করেন না"। (সূরা মায়িদাহঃ ৫১ নং আয়াত)

(৯) রাসূল (ﷺ) এর শরীয়ত থেকে বের হয়ে যাওয়া বৈধ মনে করাঃ

অর্থাৎ-কেউ যদি মনে করে যে, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করা বৈধ, তা হলে সে ব্যক্তিও মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে। কেননা মহান আল্লাহ ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন গ্রহণ করেন না। এ ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে ঃ

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) سورة آل عمران : ٨٥

অর্থঃ "আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অর্ন্তভূক্ত হবে"। (সূরা আল ইমরানঃ ৮৫ নং আয়াত)

অতএব, মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পছন্দনীয় দ্বীন হলো ইসলাম। আর দ্বীন ইসলাম গ্রহণ না করে অন্য ধর্মের উপর থাকা অবস্থায় কেউ

মৃত্যু বরণ করলে সে কখনই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না বরং সে অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে।

(১০) আল্লাহর দ্বীন হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হওয়াঃ অর্থাৎ-দুনিয়াকেই সব কিছু মনে করে তার পিছনে ছুটা এবং দ্বীন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়া। যার ফলে সে দ্বীন ইসলামকে শিক্ষা করে না এবং তার উপর আমলও করে না। উপরোক্ত কারণ গুলির জন্যও মুসলমান থেকে বেরিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) سورة السجدة : ٢٢

অর্থঃ "যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি"। (সূরা সাজদাহ ঃ ২২ নং আয়াত) এই হলো ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হওয়ার দশটি মূল কারণ। 'হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এগুলি থেকে রক্ষা করো। আমীন!

মতবিরোধের সময় মুক্তি পাওয়ার উপায়

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষেরা একেকজন একেক দলের কাতারে শামিল হচ্ছে। বিশেষ করে মুসলিমদের আল্লাহ্ এক, কা'বা এক, শেষ নবী এক, কুরআন এক, দ্বীন এক তার পরেও দেখা যায় যে, তাদের ভিতরে দলাদলী, বিভক্তি ও মনোমালিন্য এবং প্রত্যেকে নিজেদের দলের দিকে আহ্বান করছে ও নিজেদের দলকে সঠিক দল বলে দাবী করছে এবং তার দলের নিয়ম নীতিকেই অভ্রান্ত

সত্য বলে জানছে। তার এই দাবী করাটাই স্বাভাবিক, যেহেতু সে উক্ত দলের সাথে সম্পৃক্ত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

(مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) سورة الروم : ٣٢

অর্থঃ "যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল"। (সূরা রুম ঃ আয়াত নং৩২)

কাজেই বুঝা গেল যে, কেউই তার দলকে ঘৃণা করে না, রবং তাকে নিয়ে সে আনন্দবোধ করতে থাকে। তা হলে আসুন আমরা দেখি নাজাত প্রাপ্ত দল কোনটি এবং কোন ধরণের দল করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) سورة آل عمران : ١٠٤

অর্থঃ "আর তোমাদের মধ্যে এরুপ একটি সম্প্রদায় (দল) হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহবান করে এবং ভাল কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজের নিষেধ করে আর তারাই সুফল (নাজাত) প্রাপ্ত হবে"। (সূরা আল ইমরান ঃ ১০৪ নং আয়াত)

উপরোক্ত আয়াত থেকে জানা গেল, যে দলের লোকেরা কল্যাণ ও ভাল কাজ করতে আদেশ করে এবং অন্যায় ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান করে সে দলই আমাদেরকে করতে হবে। আর এই ভাল-মন্দের বিচার হবে আল্লাহর দেখানো এবং রাসূল (ﷺ) এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) سورة يوسف : ١٠٨

অর্থঃ "(হে রাসূল)আপনি বলুনঃ এটাই আমার পথ, আমি সজ্ঞানে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি, আমি এবং আমার অনুসারীগণও, আর আল্লাহ্ মহিমান্বিত, আর যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে আমি তাদের অর্ন্তভূক্ত নই "। (সূরা ইউসূফ ঃ ১০৮ নং আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ হলোঃ সজ্ঞানে ইল্‌ম সহকারে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকতে হবে, বিনা জ্ঞানে নয়। আল্লাহ্ ও রাসূলের পথে ডাকার উত্তম জ্ঞান হলো ঃ পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের জ্ঞান। আর এই জ্ঞানার্জন করা ইসলামে ফরয করা হয়েছে। কোন বিষয়ে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের জ্ঞান না থাকলে, অজানা সত্ত্বেও মানুষ কি বলবে এই ভেবে কোন ফাতওয়া প্রদান করা ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ। তাই তো পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের জ্ঞান মোতাবেক আল্লাহ্ তায়া'লা একতাবদ্ধ থাকতে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে সহযোগীতা করতে আদেশ দিয়েছেন এবং পরষ্পর বিচ্ছিন্ন হতে ও মতানৈক্য সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তায়া'লা বলেনঃ

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) سورة آل عمران : ١٠٣

অর্থঃ "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে অনুগ্রহ রয়েছে তা স্বরণ কর: যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে অতঃপর তিনিই তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে এবং তোমরা অগ্নিকুন্ডের ধারে ছিলে অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে তা হতে উদ্ধার করেছেন; এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত

করেন যেন তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হও"। (সূরা আল ইমরান ঃ ১০৩ নং আয়াত)
উপরোক্ত আয়াতে মহিমান্বিত আল্লাহ তায়া'লা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়ে আমাদেরকে একটি দলেরই অর্ন্তভূক্ত হওয়ার নির্দেশ করেন, আর সে দলটিই হলো মুক্তি প্রাপ্ত আল্লাহর দল। আর যারা আল্লাহর দলের অন্তর্ভূক্ত হবে তাদের কোন চিন্তা এবং ভয় থাকবে না বরং তারা হবে সফলকামী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ
(أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) سورة المجادلة (٢٢)
অর্থঃ "তারাই আল্লাহর দল, জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে"। (সূরা মুজাদালাহঃ ২২ নং আয়াত)
প্রিয় রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে সাবধান করে বলেছেন যেঃ তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব-ইয়াহুদীরা ৭১ এবং খ্রীষ্টানরা-৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে আর এই মিল্লাত (আমার উম্মত) ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে-জাহান্নামে যাবে ৭২টি দল এবং একটি দল যাবে জান্নাতে, আর সেটি হল জামা'আত"। (ইমাম আহমাদ ও মুয়াত্তা ইমাম মালেক ও মুসনাদে বায্যার ঃ ২৭৫৫ নং হাদীস মুসতাদরাক হিন্দি ১ম খন্ড ১২৯ পৃঃ)
(এই জামাআত বলতে কোন পার্টির নামকে বুঝানো হয়নি, বরং যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (ﷺ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পদাংক অনুসরণ করে চলবে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে)। উক্ত হাদীসটি অপর এক বর্ণনায় এসেছে ঃ নবী (ﷺ) বলেনঃ "কেবল একটি দল ব্যতীত সব দলই জাহান্নামে যাবে। আর সেটি হলোঃ ঐ দল যে দলটি আমি ও আমার সাহাবাগণের রাযিয়াল্লাহু আনহুম এর অনুসারী হবে"। (তিরমিযি ও সহীহ আলবানী ৫২১৯ নং হাদীস)
অতএব, মুক্তি প্রাপ্ত দলের পরিচয় হলো যে, তারা একতাবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে অর্থাৎ পবিত্র কুরআন এবং রাসূল (ﷺ) এর সহীহ হাদীস সমূহকে এবং

খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে হাতে দাঁতে আঁকড়ে ধরবে। এ ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেছেনঃ

অর্থঃ "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ভীতি, (নেতার নেতৃত্ব) মানতে ও আনুগত্য করতে অসীয়ত করছি, যদিও তোমাদের নেতা একজন হাবশী ক্রীতদাস হোক না কেন। যেহেতু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার (মৃত্যুর) পরেও জীবিত থাকবে সে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত এবং সুপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অবলম্বন করবে এবং তা শক্তভাবে হাতে-দাঁতে আকঁড়ে ধরবে। আর নব উদ্ভাবিত সকল কর্ম থেকে দূরে থাকবে। কেননা সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই হলো বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আত হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার স্থান জাহান্নাম"। (নাসাঈ, তিরমিযি হাসান সনদে ও শরহু মুশকিলুল আসার ঃ ১১৮৬ নং হাদীস)

আল্লাহর রাসূলের আদর্শ কোন পথে কিভাবে মানতে হবে সে জন্য একদা রাসূল (ﷺ) স্বহস্তে মাটিতে একটি সরল রেখা টানলেন অতঃপর বললেনঃ "এটি আল্লাহর সরল পথ, তারপর ঐ রেখাটির ডানে ও বামে (আঁকা-বাঁকা) আরও কয়েকটি রেখা টেনে বললেনঃ এগুলি বিভিন্ন পথ। এ গুলির প্রত্যেকটির (মাথার) উপর একজন করে শয়তান আছে, সে ঐ পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করে। অতঃপর তিনি আল্লাহর এই বাণী পাঠ করলেনঃ

(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) سورة الأنعام : ١٥٣

অর্থঃ "আর নিশ্চয়ই ইহা আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা সাবধান হও"!। (সূরা আনআমঃ ১৫৩ নং আয়াত) (উক্ত হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন)

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমাদেরকে মুক্তি পেতে হলে দলাদলী পরিহার করে আল্লাহর দলকেই বেছে নিতে হবে নইলে নিস্তার নাই। আর এভাবেই আমরা আল্লাহর মুক্তি প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভূক্তি হয়ে দলাদলী ও মতবিরোধের সময় মুক্তি পেতে পারি। নাজাত প্রাপ্ত দলের আরও কিছু পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মুক্তি প্রাপ্ত দলের পরিচয়

মুক্তি প্রাপ্ত দলের পরিচয় হলো নিম্নরুপ ঃ

(ক) তারা নিজেরা আল্লাহর উপর ঈমান নিয়ে আসে এবং সর্বদাই লোকদেরকে সৎ, কল্যাণ ও মঙ্গলময় কাজের দিকে আহবান জানায় এবং সে জন্যই উক্ত দলের আবির্ভাব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه) سورة آل عمران : ١١٠

অর্থঃ "তোমরাই মানবমন্ডলীর জন্য শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় (দল) রুপে সমুদ্ভূত হয়েছ, তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর"। (সূরা আল ইমরানঃ ১১০ নং আয়াত)

(খ) তারা রাসূল (ﷺ) এর সহীহ হাদীস এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে হাতে দাঁতে আঁকড়ে ধরে। (নাসাঈ ও তিরমিযি)

(গ) তারা কোন বিষয়ে মতপার্থক্য ও মতভেদ দেখা দিলে তার সমাধানের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর সহীহ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। দলীল আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী ঃ

(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) سورة النساء : ٥٩

অর্থঃ "অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয়, তবে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক, এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর সমাধান"। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৯ নং আয়াত)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর ও রাসূল (ﷺ) এর আদেশ-নিষেধ মানাটাই তাঁর প্রতি ঈমান থাকা ও পরকালে বিশ্বাস করার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। অন্য আয়াতে এসেছেঃ অর্থঃ "তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন তার মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট। (বলঃ) তিনিই আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, আমি ভরসা করি তাঁর উপর এবং আমি তাঁরই অভিমূখী"। (সুরা শুরা ঃ ১০ নং আয়াত)

(ঘ) তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের কথার উপরে আর অন্য কারো কথাকে প্রাধান্য দেয় না বরং তাঁরা আল্লাহ্ ও রাসূলের কথার সামনে আর কোন কথায়ই অগ্রগামী হন না। (সূরা হুজুরাতঃ ১ নং আয়াত)

(ঙ) তারা সর্বাগ্রে তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ঘটানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালায়, যেহেতু আল্লাহ্ তা'য়ালা যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের সকলের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল যে, তোমরা লোকদেরকে একমাত্র আল্লাহ্‌র তাওহীদ তথা একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানাবে ও শিরক থেকে বারণ করবে। (সূরা নিসা ঃ ৩৬ নং আয়াত)।

(চ) তারা তাদের চলার পথে, আচার-আচরণে, ইবাদত-বন্দেগীতে রাসূল (ﷺ) এর জীবনাদর্শকে উত্তম আদর্শরূপে গ্রহণ করে এবং তাঁর

পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সহীহ হাদীস গুলিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। (সূরা আহযাবঃ ২১ নং আয়াত)

(ছ) তারা শিরক ও বিদ'আতের ঘোরবিরোধী। যেহেতু ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা ও রাসূল (ﷺ) এর নিরংকুশ অনুসরণ ও অনুকরণ করা। (সূরা বাইয়্যিনাহঃ ৫ নং আয়াত)

(জ) তারা মনগড়া ও মানব রচিত সকল আইন ও কানুনকে অস্বীকার করে। যেহেতু আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা অতএব, বিধান ও হুকুমও চলবে তাঁরই, যেমন আল্লাহ বলেন:-

(أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) سورة الأعراف: ٥٤

অর্থঃ "জেনে রাখো; সৃষ্টি ও হুকুমের একমাত্র মালিক তিনিই (আল্লাহ), সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ হলেন বরকতময়"। (সূরা আরাফঃ ৫৪ নং আয়াত) আর যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফয়সালা করে না তাদেরকে তিনি কখনো যালেম, কখনো ফাসেক আবার কখনো কাফের বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) سورة المائدة : ٤٥

অর্থঃ "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিচার ফয়সালা করে না তারাই জালেম" (বা সীমালংঘনকারী)। (সূরা মায়িদাঃ ৪৫ নং আয়াত) (আরও দেখুন উক্ত সূরার ৪৪ ও ৪৭ নং আয়াত)

(ঝ) তারা সংখ্যায় কম হবেন। (সূরা সাবা ঃ ১৩ নং আয়াত)

(ঞ) তারা আহলুল হাদীস। তারা কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তাদের কেউ কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। (সহীহ মুসলিম)

(ট) তারা তাদের জান-মাল, বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা ন্যায়ের পথে সংগ্রাম করে। (সূরা সাফ্ঃ ১১ নং আয়াত)

(ঠ) তাদের বিভিন্ন নাম বর্তমান সমাজে পাওয়া যায়। যেমনঃ ইমাম বূখারী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেছেনঃ তারা হলেন আসহাবুল হাদীস অর্থাৎ- আহলূল হাদীস। আর আহলুল হাদীস তারাই যারা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর সর্বদাই আমল করে। যেহেতু মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআন মাজীদকে বিভিন্ন জায়গায় হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ

(فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) سورة الأعراف : ١٨٥

অর্থ ঃ "সুতরাং তারা কুরআনের পর কোন কথার (হাদীসের) ওপর ঈমান আনবে"? (সূরা আ'রাফ ঃ ১৮৫ নং আয়াত) উক্ত আয়াতে হাদীস বলে কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। অন্য একটি আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا) الكهف (٦)

অর্থ ঃ "যদি তারা এই বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবতঃ আপনি দুঃখ করতে করতে নিজের প্রাণ বিসর্জন করবেন"। (সূরা কাহ্ফঃ ৬ নং আয়াত) উক্ত আয়াতেও হাদীস শব্দ উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনের বাণীকেই বুঝানো হয়েছে) অন্য আয়াতে এসেছে ঃ

(اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا) سورة الزمر : ٢٣

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ সর্বোত্তম বাণী (হাদীস) কিতাব রুপে নাযিল করেছেন"। (সূরা জুমারঃ ২৩ নং আয়াত) উক্ত আয়াতেও আল্লাহ হাদীস বলে কুরআনকেই বুঝিয়েছেন। এ রকম আরও অনেক দলীল আছে যেগুলি দ্বারা পবিত্র কুরআনকে হাদীস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তাই যারা আহলুল হাদীস তারা মূলতঃ কুরআন ও হাদীস উভয়টিকেই মেনে চলে। ইমাম ইবনুল মুবারকও এই মত ব্যক্ত করেছেন। আর তাদের আর একটি নাম হলোঃ তায়েফা মানসুরাহ, অর্থাৎ-সাহায্য প্রাপ্ত দল।

তাই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, এই সাহায্য প্রাপ্ত দলটি যদি আসহাবুল হাদীস-না হয় তবে আমি জানি না তারা কারা। তারা সালাফী বলেও পরিচিত এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত নামেও তাদের পরিচিতি বিদ্যমান। (উপরোক্ত আলোচনা গুলির বিস্তারিত বর্ণনা দেখুনঃ শায়েখ মুহাম্মাদ বিন জামিল জাইনু কর্তৃক রচিত "ফির্কাহ নাজিয়াহ" গ্রন্থের পৃঃ ৪-১৪)

পরিশেষে, আহ্বানে বলব ঃ আসুন আমরা সকল প্রকার দল, মত, পথ, মতোপার্থক্য ও বিরোধ ভূলে এক ও অভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী হই এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এর সুমহান রজ্জুকে আকঁড়ে ধরি ও যাবতীয় দলাদলি ও বিরোধকে পদাঘাৎ করি। কেননা মহান আল্লাহ সমাজে বিভক্তি করতে নিষেধ করে বলেন ঃ

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) سورة آل عمران : ١٠٥

অর্থঃ "আর তোমরা তাদের সাদৃশ্য হয়ো না, যাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরও তারা বিভক্ত হয়েছে এবং পরস্পর বিরোধ করেছে, আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর শাস্তি"। (সূরা আল ইমরানঃ ১০৫ নং আয়াত)

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, 'হে আল্লাহ তুমি মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের এক ও অভিন্ন কালিমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর পতাকাতলে সমবেত কর এবং রাসূল (ﷺ)কে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ বানিয়ে দাও আর ইসলাম ও মুসলিমদেরকে তুমি সাহায্য কর ! আমীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدً وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

প্রমাণপঞ্জী

১। বাংলা তাফসীর কুরআনুল কারীম। প্রফেসার ডক্টর মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান।
২। তাইসীরুল কারীমুর রহমান- আল্লামা শাইখ আব্দুর রহমান নাসির আস সা'দী।
৩। সহীহুল বুখারী ঃ ইমাম হাফিজ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম বিন মুগীরাহ বিন বারদেযাবাহ আল বুখারী। (রাহিমাহুল্লাহ) (১৯৪-২৫৬ হিজরী)
৪। সহীহ মুসলিম ঃ ইমাম হাফিজ আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন মুসলিমুল কুশাইরী আন নিসাপুরী । (রাহিমাহুল্লাহ) (২০৬-২৬১ হিজরী)
৫। সুনানু আবি দাউদ ঃ ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস বিন ইসহাকুল আযদী সিজিস্তানী। (রাহিমাহুল্লাহ) (২০২-২৭৫ হিজরী)
৬। জা'মে তিরমিযিঃ হাফিজ আবু ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন সুরা বিন মুসা আত তিরমিযি। (রাহিমাহুল্লাহ) (২০০-২৭৯ হি)
৭। সুনানু নাসাঈ ঃ আবু আব্দুর রহমান আহমাদ বিন শুআইব বিন আলী বিন সিনান আন নাসাঈ। (রাহিমাহুল্লাহ) (২১৫-৩০৩ হিজরী)
৮। সুনানু ইবনে মাযাহঃ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাযাহ আল কাযবীনি। (রাহিমাহুল্লাহ) (২০৯-২৭৩ হিজরী)
৯। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ঃ আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে হাম্মল। (রাহিমাহুল্লাহ) (১৬৪-২৪১ হিজরী)
১০। "ফির্কাহ নাজিয়াহ"- শায়েখ মুহাম্মাদ বিন জামিল জাইনু কর্তৃক রচিত।
১১। আর-রাহীকুল মাখতুম-শাইখ আল্লামা সফীউর রহমান মুবারকপুরী। (রাহিমাহুল্লাহ)
১২। কিতাবুত তাওহীদ - শাইখ ডক্টর সালেহ বিন ফাওযান আল ফাওযান। (হাফিযাহুল্লাহ)
১৩। 'দ্বীনুল হক্ব' শাইখঃ আব্দুর রহমান হাম্মাদ আলে উমার, সউদী ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত।
১৪। "ফাযলুল ইসলাম" বা ইসলামের ফযীলত-শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক রচিত।
১৫। 'উসূলুস সালাসাহ' বা 'তিনটি মৌলনীতি'-শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক রচিত।
১৬। বাংলা বই 'মনোনীত ধর্ম'- শাইখ আব্দুর রব্ব বিন আফ্‌ফান (হাফিযাহুল্লাহ) কর্তৃক রচিত।